যে ক্ষেত্রে রবির মা-র কম কষ্ট হয়েছে, সেক্ষেত্রে রবির মা কী জিনিস ব্যবহার করায় সেটা সম্ভব হয়েছে? ভাবো।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, রবির মা ব্যবহার করেছেন একটা **সরল যন্ত্র**। এই যন্ত্রের নাম **পুলি বা কপিকল**। আর এই চক্রই রবির মায়ের কুয়ো থেকে জল তোলার কাজ সহজ করে দিয়েছে।

কপিকল হলো একটা **শক্তপোক্ত চাকা**। রাস্তায় চললে চাকার যে স্থান মাটিতে স্পর্শ করে, পুলির সেই স্থানের মাঝখানটায় গর্তকাটা থাকে, আর দু-পাশটা থাকে উঁচু। গর্তের মধ্যে চক্রকে ঘিরে থাকে একটা দড়ি। যার এক প্রান্তে **ওপর থেকে নীচের দিকে টান দেওয়া হয়**। আর অপর প্রান্তে থাকে **'বাধা' (যে বস্তুকে নীচ থেকে ওপরে তোলা হয়)**।

কপিকলের কেন্দ্রে থাকে একটা লম্বা দণ্ড বা অ্যাক্সেল। একে কেন্দ্র করে কপিকল অবাধে ঘুরতে পারে। কপিকল, তোমার বল প্রয়োগের **দিককে ঠিক উলটো করে দেয়**। অর্থাৎ তুমি সরাসরি নীচ থেকে ওপরে দড়ির সাহায্যে কোনো বস্তুকে তুলতে চাইলে, বস্তুটি উঠছে উপরের দিকে কিন্তু তোমার বল প্রয়োগ করতে হচ্ছে নীচের দিকে। কপিকল তুমি আর কোথায় কোথায় ব্যবহার করতে দেখেছ তা পাশে লিখে ফেলো। .....।

চক্র ও অক্ষদণ্ড

একটা পিচবোর্ড কেটে বৃত্ত তৈরি করো। বৃত্তটার কেন্দ্র দিয়ে পেনসিল বা পেন আঁটোসাঁটোভাবে প্রবেশ করাও। প্রয়োজনে বৃত্ত ও পেনসিলের (বা পেনের) সংযোগস্থলে আঠা ব্যবহার করো। দেখো তোমার বানানো জিনিসটির সঙ্গে স্ক্রু-ডাইভার, রেডিয়োর নব, ট্যাপের মাথার অংশের অনেক মিল আছে।

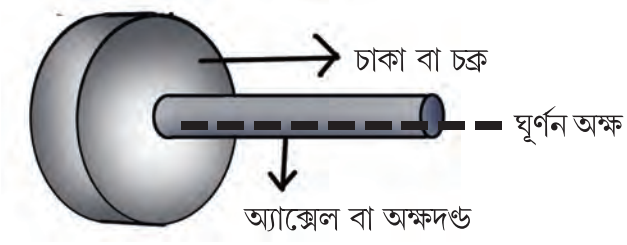

ওই বৃত্ত আর পেনসিল বা পেন দিয়ে তুমি আসলে বানিয়ে ফেলেছ একটা সরল যন্ত্র। এই যন্ত্রকে বলে **'চক্র ও অক্ষদণ্ড**।

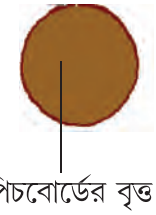

ওই পিচবোর্ডের বৃত্তটা হলো **চক্র**।

পেনসিল বা পেনটা হলো **অক্ষদণ্ড** ।

এবার, পিচবোর্ডের বৃত্তটাকে একপাক পুরো ঘুরিয়ে দেখো পেনসিল বা পেনটা একপাকই ঘুরছে।

এই চক্র ও অক্ষদণ্ড উভয়েই একসঙ্গে তাদের একই কেন্দ্র দিয়ে যাওয়া **স্থির অক্ষকে** কেন্দ্র করে অবাধে ঘুরতে পারে। এই অক্ষকে **ঘূর্ণনঅক্ষ** বলে।

চক্রটিতে অপেক্ষাকৃত কম বল প্রয়োগ করে বেশি বাধা অতিক্রম করা যায়।

আর, কোথায় কোথায় চক্র ও অক্ষদণ্ডের ব্যবহার তুমি দেখেছ তা নীচে লেখো।

আখ পেষাই যন্ত্র .....।

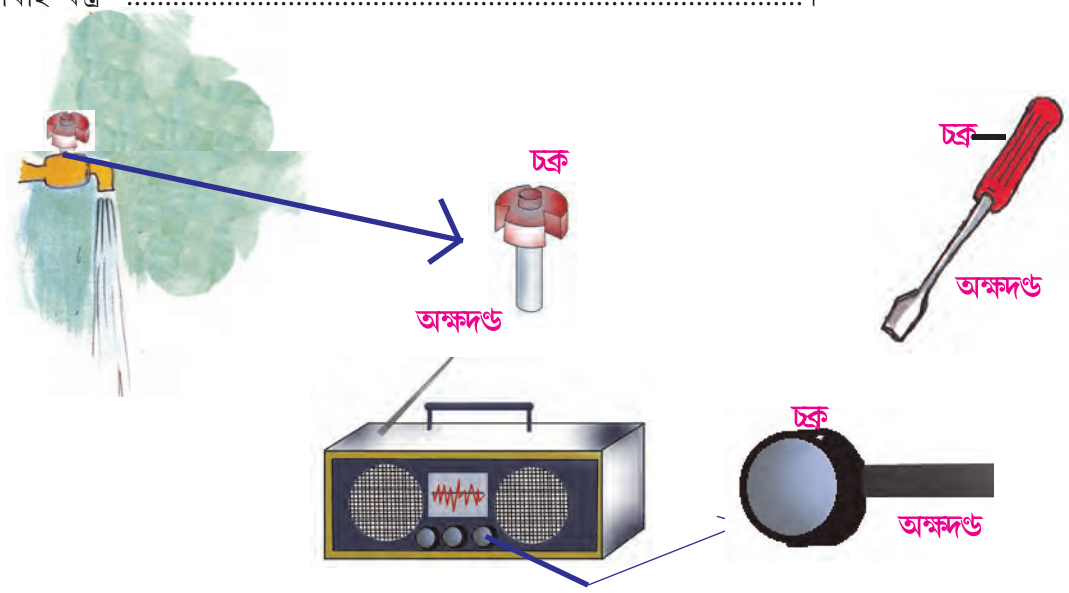

যন্ত্রের পরিচর্যা

ভেবে দেখো তো

- তুমি প্রতিদিন স্নান করো কেন? দাঁত মাজো কেন?
- বাড়িঘর নিয়মিত পরিষ্কার রাখা হয় কেন?
- লোহার জিনিসপত্র নিয়মিত রং করা হয় কেন?
- খাতা-বই মলাট দিয়ে রাখো কেন?

এরকম নানা কাজ আমরা করি। নিজেকে, সমাজকে, নানা জিনিসপত্রকে ক্ষয়, ক্ষতি, দূষণ, ব্যাধি ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য।

যন্ত্রেরও তাই দরকার হয় নিয়মিত যত্ন বা পরিচর্যা। এসো, আলোচনা করি, কীভাবে যন্ত্রের পরিচর্যা করা যায়।

(1) যন্ত্রের যে অংশ চলমান বা ঘূর্ণায়মান সেই অংশে ঘর্ষণ বেশি হয়। ফলে সেই অংশ দ্রুত ক্ষয় হতে থাকে। তাই ঘর্ষণ কমাতে ওই অংশে পিচ্ছিল তেল বা গ্রিজ লাগানো উচিত।

(2) লোহার তৈরি যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ জলীয় বাষ্পের হাত থেকে রক্ষা করা দরকার। তা না হলে মরচে (জং) ধরে তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তেল রং (সিন্থেটিক এনামেল) করেও মরিচার হাত থেকে লোহার যন্ত্র বা যন্ত্রাংশকে রক্ষা করা যায়।

(3) কাজের পর যন্ত্রকে নিয়মিত পরিষ্কার করে রাখা দরকার।

10 জীববৈচিত্র্য ও তার শ্রেণিবিভাগ

সে দিন ক্লাসে স্যার বললেন— পৃথিবীতে কত ধরনের জীব আছে অনুমান করে বলত? দেবপ্রকাশ বলল — দশ হাজার।

সোনা বলল — এক লাখ।

প্রীতম বলল— দশ লাখ।

স্যার মাথা নাড়ছিলেন। সবাই মিলে তখন জিজ্ঞাসা করল — তাহলে কত স্যার?

স্যার মুচকি হেসে বললেন — প্রায় তিন কোটি! বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন সারা পৃথিবীতে তিন কোটি বা তারও বেশি প্রজাতির জীব বাস করে।

সমীর বলল— প্রজাতি কী?

স্যার বললেন— একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীবকে প্রজাতি বলে, ইংরাজিতে বলে স্পিসিস (species)। একই প্রজাতির জীব থেকে সেই একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত ধরনের জীব জন্ম নেয়। যেমন ধরো বাঘ একটা প্রজাতি, বিড়াল একটা প্রজাতি। শালিখ একটা প্রজাতি, চড়ুই একটা প্রজাতি। কাকদের মধ্যে শহরে যে গলায় ছাই ছাই রং-এর কাক দেখি সেই পাতিকাক একটা প্রজাতি। আবার, গ্রামের দিকে পুরো দেহ কুচকুচে কালো রং-এর যে দাঁড়কাক দেখা যায় সেটা অন্য একটা প্রজাতি। এরকম সাপ, ব্যাং, মাছ-সবার মধ্যেই জীবরা আলাদা আলাদা প্রজাতি হিসাবে থাকে।

সৈকত বলল— গাছদের মধ্যেও প্রজাতি হয় স্যার?

— নিশ্চয়! আমগাছ, নিমগাছ, নারকেলগাছ, বকুল, কৃষ্ণচূড়া, ইউক্যালিপটাস— সবাই আলাদা আলাদা প্রজাতি।

পারভিন হঠাৎ হাত তুলে বলল — মানুষও কি একটা প্রজাতি?

— অবশ্যই! সারা পৃথিবী জুড়ে যত মানুষ আছে তারা যেরকম দেখতেই হোক বা যে ধর্মেরই হোক সবাই একই প্রজাতির। সবাই হলো *হোমো সেপিয়েন্স* (*Homo sapiens*)। বিজ্ঞানীরা মানুষ প্রজাতির এই নামই দিয়েছেন।

বিজ্ঞানীরা মানুষের আলাদা একটা নাম দিয়েছেন কেন — সোমা জিজ্ঞাসা করল।

— বারে! সাধারণ মানুষ তো একধরনের জীবকে তাদের ভাষায় একটা নামে ডাকে। বিভিন্ন জায়গায়

ভাষা অনুযায়ী একই প্রজাতির জীবের বিভিন্ন নাম। যেমন— আমরা বলি বাঘ, ইংরেজরা টাইগার (Tiger), হিন্দিভাষীরা বলে — শের, দক্ষিণভারতে কোথাও বাঘকে বলা হয় — হুলি বা কোথাও পুলি। এবার বলো—বাঘ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞানীরা আলোচনা করতে বসলে গুলিয়ে যাবে না। বিজ্ঞানীর কাছে তাই বাঘের একটাই নাম— *প্যানথেরা টাইগ্রিস* (*Panthera tigris*)। একইরকমভাবে, প্রত্যেক প্রজাতির একটা করে বৈজ্ঞানিক নাম থাকে।

দেবপ্রকাশ এবার প্রশ্ন করল — তিন কোটি প্রজাতির তাহলে তিন কোটি বৈজ্ঞানিক নাম আছে?

—বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত মাত্র উনিশ লক্ষের মতো প্রজাতির জীবের বৈজ্ঞানিক নাম দিয়ে উঠতে পেরেছেন। ভেবেচিন্তে সবাই একমত হয়ে প্রজাতির নাম দিতে হয় তো — তাই সময় লাগে।

এবার সমীরের মাথায় প্রশ্ন এল— নাম না হয় আলাদা হলো— কিন্তু তিন কোটি জীব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের মাথা গুলিয়ে যায় না?

স্যারকে সেটা বলতে স্যার বললেন— গুলোবারই তো কথা। তার জন্য ওঁরা কী করছেন বলছি। আচ্ছা, তোমরা তো বইয়ের দোকানে বই কিনতে গেছ। সেখানে তো হাজারখানেক নানাধরনের বই। তার মধ্যে থেকে দোকানদার কাকু কী করে এক নিমেষে তোমার বইটা বের করে দেন?

রতন এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এবার সে বলে উঠল— আমি জানি, আমার বাবা বইয়ের দোকানে কাজ করেন। বিষয় অনুসারে বইগুলোকে আলাদা আলাদা র‍্যাকে রাখা হয়। কাগজ সেঁটে সেই র‍্যাকের বিষয়টার নাম লেখাও থাকে। আবার, একটা র‍্যাকের ভিতর একই বিষয়ের কিন্তু আলাদা ক্লাসের বই আলাদা আলাদা করে রাখা থাকে। কেউ কোনো বই চাইলে সেটা চট করে খুঁজে পাওয়া যায়।

সমীর বলল— ওষুধের দোকানেও ওরকম সাজিয়ে রাখে। আমাদের পাড়ার ওষুধের দোকানে দেখেছি। ওষুধের নামের প্রথম অক্ষর অনুযায়ী ওষুধগুলো সাজানো থাকে। (A) দিয়ে যে ওষুধের নাম শুরু, সেটা থাকে 'A' লেখা তাকে। 'B' দিয়ে যে ওষুধের নাম সেটা থাকে 'B' লেখা তাকে— এরকম।

— না হলে প্রেসক্রিপশন দেখে ওষুধ খুঁজে বের করতে দোকানদারের সারাদিন লেগে যাবে হয়তো। যে-কোনো জিনিসই যদি অনেক ধরনের হয়— তাকে একটা নিয়ম মেনে সাজিয়ে নিতে হয়। বিজ্ঞানীরাও তাই তিন কোটি প্রজাতিকে সাজিয়ে নেন।

পারভিন তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করে— কীভাবে স্যার?

—সেটাই বলছি। বিজ্ঞানীরা প্রজাতিদের নিয়ে যে জীবজগৎ তাকে ছ-টা ভাগে ভাগ করেন। একেকটা ভাগকে বলা হয় একেকটা জীবরাজ্য বা কিংডাম (Kingdom)। জীবজগতে এই ছ-টা রাজ্যের এক একটার এক এক রকম নাম— যেমন প্রাণীদের রাজ্য হলো অ্যানিমালিয়া (Animalia)। গাছপালা, শ্যাওলা মস— সব উদ্ভিদ নিয়ে রাজ্য প্ল্যান্টি (Plantae)। ব্যাঙের ছাতা আর অন্যান্য সব ছত্রাকদের রাজ্য হলো ফানজাই (Fungi)। এককোশী জীব অর্থাৎ যাদের দেহ বলতে একটাই কোশ তাদেরও আবার তিনটে রাজ্যে ভাগ করা হয়- ব্যাকটেরিয়ার রাজ্য- যার নাম ব্যাকটেরিয়া। এছাড়াও অ্যামিবা, জিয়ার্ডিয়া, ইউগ্লিনা, প্লাসমোডিয়াম, প্যারামেসিয়াম— এরকম এককোশী জীবদের রাজ্যের নাম— প্রোটোজোয়া (Protozoa)। এছাড়াও, আর একটা রাজ্য আছে এককোশী জীবদের, তার নাম ক্রোমিস্টা (Chromista)। তাদের কথা আমরা কম জানি।

প্রাণী

উদ্ভিদ

ছত্রাক

ব্যাকটেরিয়া

সোমা প্রশ্ন করল— আমি শুনেছি, আমাদের শরীরে ভাইরাস ঢুকলে তো ভাইরাল রোগ হয়।

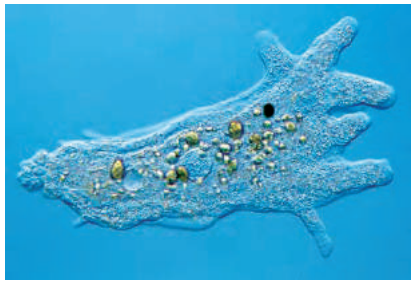

প্রোটোজোয়া

ক্রোমিস্টা

স্যার বললেন— ঠিক বলেছ। কিন্তু ভাইরাস ঠিক পুরোপুরি জীব নয়। জীব আর জড় পদার্থের মাঝামাঝি অবস্থা। তাই জীবরাজ্যে তাদের ঠাঁই হয়নি। তবে আমরা এখানে জীবজগতের অন্য আর একধরনের শ্রেণিবিভাগ নিয়ে আলোচনা করব। এই শ্রেণিবিভাগে জীবজগতকে পাঁচটা রাজ্যে ভাগ করা হয়। প্রাণীদের রাজ্য অ্যানিমালিয়া (Animalia), ছত্রাকদের রাজ্য ফানজাই (Fungi) উদ্ভিদদের রাজ্য প্ল্যান্টি (Plantae), ব্যাকটেরিয়ার রাজ্য মোনেরা (Monera) আর এককোশী জীবদের রাজ্য প্রোটিস্টা (Protista)।

জীব রাজ্যের প্রজাতিদের মধ্যে কোনো ভাগ নেই?— রতন জিজ্ঞাসা করল।

— নেই আবার, প্রাণীরাজ্যেই কত ভাগ। তোমরাই বলো না— প্রথমে যাদের দেহে কোনো মেরুদণ্ড নেই অর্থাৎ, অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের কথা বলো।

সমীর প্রথমেই বলল— পোকামাকড়।

হ্যাঁ। পোকা, মাকড়সা, এমনকি চিংড়ি, কাঁকড়া এদের সবাইকে একসঙ্গে বলা হয় আর্থ্রোপোডা (Arthropoda)। এদের শুঁড় আর পা-গুলো খণ্ডে খণ্ডে থাকে আর গায়ের উপর একটা শক্ত খোলা থাকে।

পারভিন বলল— শামুক, ঝিনুক।

স্যার বললেন— শামুক, ঝিনুক, এমনকি সমুদ্রে থাকে যে অক্টোপাস, তারা সবাই একই জাতের, এদের চলাফেরার জন্য মাংসল পা থাকে। আর নরম গায়ের বাইরে বা ভিতরে থাকে একটা চুনজাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি খোলক। এদের বলে মোলাস্কা (Mollusca)। এইভাবে আলোচনা করতে করতে ওরা স্যারের কাছ থেকে আরও অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের কথা জানল।

ওরা যেসব অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের কথা জানল, সেগুলো হলো—

প্রাণীদের নাম	এদের কী বৈশিষ্ট্য	এদের জাত কে কী বলা হয়
পোকা, মাকড়সা, কাঁকড়া, চিংড়ি		আর্থ্রোপোডা
		মোলাস্কা
কেঁচো, জোঁক		অ্যানিলিডা
গোলকৃমি	মানুষ বা অন্য প্রাণীর পেটে বাস করে।	অ্যাস্কহেলমিনথেস
চ্যাপটা কৃমি	মানুষ বা অন্য প্রাণীর পেটে বাস করে অর্থাৎ পরজীবী। স্বাধীনভাবে বাস করে অল্প কয়েক ধরনের চ্যাপ্টা কৃমি।	প্লাটিহেলমিনথেস
তারা মাছ (স্টারফিশ), সি-আরচিন	সারা গায়ের ত্বকে কাঁটা থাকে, মুখ দেহের নীচের দিকে থাকে।	একাইনোডার্মাটা

কেঁচো

গোলকৃমি

চ্যাপটা কৃমি

তারা মাছ

প্রাণীদের নাম	এদের কী বৈশিষ্ট্য	এদের জাতকে কী বলা হয়
রুই, শিঙি (মাছ), ব্যাং (উভচর), সাপ, টিকটিকি (সরীসৃপ), পায়রা, শালিক (পাখি), গোরু, মানুষ (স্তন্যপায়ী)	এদের দেহের মাঝ বরাবর ভ্রূণ অবস্থায় নোটোকর্ড নামে একটা দণ্ড থাকে। প্রথম স্তম্ভে দেওয়া প্রাণীদের পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নোটোকর্ড থেকে মেরুদণ্ড গজায়।	কর্ডাটা; প্রথম স্তম্ভে দেওয়া প্রাণীরা, যাদের নোটোকর্ডের বদলে মেরুদণ্ড গজায় তারা হলো মেরুদণ্ডী বা ভার্টিব্রেট প্রাণী। তবে কর্ডাটাদের মধ্যে অনেকের পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নোটোকর্ড থেকে মেরুদন্ড গজায় না।

মাছ

উভচর

সরীসৃপ

পাখি

স্তন্যপায়ী

সবশেষে যে প্রাণীদের ভাগটার কথা স্যার বোর্ডে লিখলেন তার নাম— মেরুদণ্ডী। লিখে বললেন— এবার আমি শুধু মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে যে বিভিন্ন জাতের প্রাণী আছে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখছি একদিকে, তোমরা অন্যদিকে সেই জাতটার নাম কী তা লিখবে। তাহলেই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে কটা ভাগ সেটা পেয়ে যাবে।

এই মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো	এই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভাগটার নাম
1. জলে থাকে, গায়ে আঁশ, পাখনা নেড়ে চলাফেরা করে, ফুলকা দিয়ে শ্বাস নেয়।	1. মাছ
2. বাচ্চাবেলায় জলে থাকে, লেজ নেড়ে সাঁতার কাটে, বড়ো হলে ডাঙার চারপাশে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে।	2.
3. ডাঙাতেই ডিম পাড়ে, ডাঙাতেই বড়ো হয়, চলার সময় বুক মাটিতে ঘষটে যায়।	3.
4. গা পালকে ঢাকা, ডানা মেলে উড়তে পাড়ে, ডিম পাড়ে, ডিম ফুটিয়ে বাচ্চাকে বড়ো করে ।	4.
5. ডিম পাড়ে না, বাচ্চা দেয়। বাচ্চাকে দুধ খাইয়ে বড়ো করে।	5.

এবার তাহলে তোমরা নীচের প্রাণীগুলোকে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নীচের বক্সে বিভিন্ন ভাগে সাজাও।

রুই, কেঁচো, বাদুড়, শেয়াল, টুনটুনি, হাতি, বেড়াল, বাঘ, শজারু, কই, পেঁচা, শকুন, কচ্ছপ, ক্যাঙারু, জলহস্তী, তিমি, কেউটে, শুশুক, আরশোলা, প্রজাপতি, গন্ডার, গোসাপ, কুমির, মাগুর মাছ, হাঙর, মানুষ, ব্যাং, স্যালামানডার, জোঁক, শামুক, ঝিনুক, মশা, মাছি।

সৈকত আবার হাত তুলল— উদ্ভিদ জগৎ অর্থাৎ প্লান্টি-দের মধ্যে প্রাণীদের মতো এরকম ভাগ করা হয়?

স্যার বললেন — হয় না আবার! তোমাদের কিছু গাছের নাম দেওয়া হলো। এদের সঙ্গে তোমাদের অনেকেরই হয়তো পরিচয় আছে। এরা কেউ কেউ খুব লম্বা প্রকৃতির হয়, মোটা গুঁড়ি আছে, আবার কেউ কেউ খুব লম্বা হয় না। কিন্তু অনেক ডালপালা নিয়ে ঝোপের আকার নেয়। আর একধরনের যারা ছোটো, ছোটো। ডালপালাও বেশি নেই। তবে এদের মধ্যে কেউ কেউ লতিয়ে চলে বা কোনো কিছুকে ধরে পেঁচিয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়। দেখো তো এদের এইভাবে সাজাতে পারো কিনা।

যারা ছোটো ছোটো, ডালপালা প্রায় নেই। কখনো-সখনো লতিয়ে বা পেঁচিয়ে চলে। এরা ছোটো গাছ। ইংরেজিতে এদের বলে হার্বস (Herbs)। আর বাংলায় বলে **বীরুৎ**।

যারা খুব বেশি লম্বা হয় না, তবে অনেক ডালপালা আছে। ঝোপের মতো দেখতে লাগে। এরা মাঝারি জাতীয়। ইংরেজিতে এদের বলে শ্রাবস (Shrubs)। আর বাংলায় বলে **গুল্ম**।

যারা লম্বা, যাদের মোটা কাঠের গুঁড়ি ও অনেক ডালপালা আছে। এরা হলো বড়ো গাছ বা **বৃক্ষ**। ইংরেজিতে ট্রি (Tree)।

তাহলে গাছেদের আকার আমরা তাদের নীচের মতো করে ভাগ করতে পারি। নীচে দেখো জোড়ায় জোড়ায় গাছেদের নাম দেওয়া আছে। ঝটপট এদের মধ্যে মিল আর অমিল কোথায় লিখে ফেলো তো।

গাছের নাম	গাছের ছবি	গাছ দুটোর মধ্যে মিল কোথায়	গাছ দুটোর মধ্যে অমিল কোথায়
1. আলু ও কুমড়ো		দুজনেই ছোটো বীরুৎ জাতীয়	
2. আমগাছ ও জবাগাছ			
3. কাঁঠালগাছ ও কলাগাছ	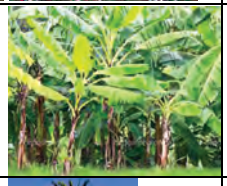		
4. ধানগাছ ও খেজুরগাছ			ধান গাছের কাণ্ড নরম ও খেজুর গাছের কাণ্ড শক্ত
5. উচ্ছেগাছ ও বেগুনগাছ			

দিদিমণি ক্লাসে ঢুকে রোলকল শুরু করলেন আর তখনি ফার্স্ট বেঞ্চে বসা অপর্ণার দিকে চোখ পড়ল। কী ব্যাপার তোমার কপাল ফুলল কী করে?

অপর্ণা বলল — কলতলায় পা পিছলে পড়ে গেছি।

— পড়ে গেলে কী করে?

কলতলাটা পিছল হয়েছিল। পরিষ্কার করা হয়নি বেশ কিছু দিন। আচ্ছা দিদি পিছল জায়গাটা কেমন সবজেটে, মা বলল ওগুলো শ্যাওলা পড়েছে। ওগুলো কি কোনো গাছ?

— হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন তোমার মা। এগুলো শ্যাওলাই। এরাও একধরনের গাছ। এরা সবুজ। তাই অন্য গাছেদের মতো নিজেদের খাবার নিজেদের দেহেই বানিয়ে ফেলে। তবে এদের দেহে কোনো মূল, কাণ্ড বা পাতা নেই। এদের কোনো ফুলও হয় না।

রাবেয়া উশখুশ করছিল দিদিকে কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য।

রাবেয়া কিছু বলবে? দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন।

রাবেয়া বলল— আমাদের পুকুরে সেদিন বাবা জাল ফেলেছিলেন। দেখি জালের গায়ে সবুজ রঙের সিল্কের সুতোর মতো লেগে আছে। ওগুলো কি কোনো শ্যাওলা?

—হ্যাঁ। তুমি ঠিকই দেখেছ। ওগুলোও একধরনের শ্যাওলা। ওদের গায়ে পিছল ভাবটা থাকে। খুব চকচক করে। ওগুলোকে জলের রেশম বা water silk বলে ।

দিদিমণি বললেন- বেশিরভাগ শ্যাওলারাই থলথলে, শরীর হড়হড়ে, মূল কাণ্ড, পাতা বলতে কিছুই নেই, এদের সবাইকে থ্যালোফাইটা বা শ্যাওলা গোষ্ঠীর মধ্যে রাখা হয়।

তোমাদের বাড়ির বা স্কুলের পাঁচিলের গায়ে বর্ষাকালে কেমন সবুজ নরম উলের চাদরের মতন একটা আস্তরণ পড়ে। দেখেছ নিশ্চয়ই। এই বর্ষাকালে বা শরৎকালেই রাস্তার ইটের ফাঁকে ফাঁকে বা মাটির ওপর স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় পয়সা বা চাকতির মতো গোল হয়ে একধরনের সবজেটে গাছ লেপটে থাকে। পাশের ছবিদুটো দেখো।

এদের কোনো ফুল, ফল হয় না। এরা সব মস জাতীয় গাছ। একসঙ্গে এদের ব্রায়োফাইট বলে। পাশের মসের ছবিটাতে দেখো ওপরের দিকে একটা তিরের মতো— তার ঠিক মাথায় একটা টুপির মতো বা তোমাদের জ্বর হলে ডাক্তারবাবু যে ক্যাপসুল খেতে দেন সেই ক্যাপসুলের মতো দেখতে অনেকটা। এই ক্যাপসুলের মধ্যেই খুব ছোটো ছোটো, একেবারে গুঁড়ি গুঁড়ি রেণু থাকে। ক্যাপসুলটা শুকিয়ে গেলে রেণুগুলো মাটিতে ভিজে জায়গায় পড়ে আবার নতুন মস হয়ে যায়।

পাশের ছবিটা ভালো করে দেখো তো। এরা পুকুরের ধারে জল-কাদার জায়গায় হয়। কখনও বা জলের ওপরেও খানিকটা ভেসে থাকে। পাতাগুলো সুন্দর সাজানো থাকে। কচিপাতা যখন বের হয় কেমন কুকুরের লেজের মতো গুটিয়ে থাকে। এটা শুশনিশাক। তোমরা বাড়িতে এই শাকটা খেয়ে থাকবে নিশ্চয়ই। এদের কোনো ফুল হয় না, ফলও হয় না। তাই শ্যাওলা ও মসদের মতো এদেরও অপুষ্পক উদ্ভিদ বলে। গাছটার গোড়ায় কতকগুলো শক্ত থলির মতো

আছে। তার মধ্যে ছোটো ছোটো রেণু থাকে। সেগুলো মাটিতে পড়ে গাছ হয়। এরা একধরনের ফার্ন । তোমরা ঢেঁকিশাক বা আরো কিছু ফার্ন যদি দেখো তাহলে দেখবে এদের পাতার নীচে বাদামি বা কালো রংয়ের ফুটকি ফুটকি আছে। কখনও বা পাতার ধারটা নীচের দিকে মুড়ে গিয়ে বাদামি বা কালো রেখা হয়ে গেছে। পাতার এই ফুটকি ফুটকি বা রেখার মধ্যেই রেণুগুলো আছে। এরা সব ফার্ন জাতীয় গাছ বা টেরিডোফাইটা।

পাশের পাইনগাছের ছবিটা দেখো। অনেকটা ঝাউগাছের মতো দেখতে। ঠান্ডা পাহাড়ি জায়গায় হয়। সরু সরু সুচের মতো পাতা। ফল নেই। বীজগুলো একসঙ্গে গোল করে সাজানো। দেখলে মনে হয় যেন কাঠ দিয়ে তৈরি কোনো ফুল। কুমড়ো, আম এদের যেমন ফলের মধ্যে বীজ থাকে পাইনের কিন্তু এরকম ফল নেই। বীজগুলোই কেবল দেখা যায়। তাই এদের **ব্যক্তবীজী** বলে। ইংরেজীতে বলে Gymnosperm।

কিন্তু আমাদের চেনা বেশিরভাগ গাছই তাদের বীজ ফলের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। তাই তারা **গুপ্তবীজী**। ইংরেজিতে বলে Angiosperm। যেমন — আম, জাম, কাঁঠাল, কুমড়ো, ধান, গম ইত্যাদি।

ছোলা আর ধান এগুলো সব বীজ। ছোলা আর ধানের খোসা ছাড়িয়ে দেখো তো নীচের ছবির মতো দেখতে পাচ্ছ কিনা।

ছোলা বীজে দুটো গোল, অনেকটা চাকতির মতো (যেগুলো আমরা খাই) অংশ আছে। আর ধানে কিন্তু এরকম একটাই লম্বাটে ধরনের অংশ আছে। এগুলোই বীজের সঙ্গে লেগে থাকা পাতা বা বীজপত্র। ইংরেজিতে বলে Cotyledon । যেসব গাছে একটা বীজপত্র থাকে সেগুলো একবীজপত্রী (Monocotyledon) । আর যাদের দুটো বীজপত্র থাকে তারা দ্বিবীজপত্রী (Dicotyledon)।

নীচের সারণিতে লেখা বীজ সংগ্রহ করে দেখো তো কারা একবীজপত্রী আর কারা দ্বিবীজপত্রী।

বীজের নাম	কটা বীজপত্র আছে	একবীজপত্রী না দ্বিবীজপত্রী
ছোলা	2	দ্বিবীজপত্রী
গম		
মুগডাল		
মুসুরডাল		
ধান		
এলাচ		
সুপুরি		
চিনেবাদাম		
খেজুর		
কুমড়ো		
ভুট্টা		

ওপরের ছবিদুটো ভালো করে দেখো তো। (একটা আমপাতা আর একটা কলাপাতা নিয়েও দেখতে পারো)

পাতা দুটোর ওপরের অংশটা কেমন? .....।

মাঝখানে কটা শিরা আছে? .....।

মাঝখানের শিরার দু-পাশ থেকে যে শিরাগুলো বেরিয়েছে সেগুলো কি নিজেদের মধ্যে আবার মিশে গিয়ে জালের আকারে আছে? নাকি কারোর সঙ্গে না মিশে সমান্তরালভাবে ভাবে আছে।

জেনে রাখা ভালো

দ্বিবীজপত্রী গাছেদের পাতার মাঝ বরাবর শিরার দু-পাশের শিরাগুলো মিশে জালের মতো তৈরি করে।

একবীজপত্রী গাছেদের পাতার মাঝ বরাবর শিরার দু-পাশের শিরাগুলো না মিশে সমান্তরালভাবে থাকে।

নীচের গাছগুলোর পাতা লক্ষ করে তালিকাটি পূরণ করে ফেলো তো।

গাছের নাম	শিরাগুলো কেমন	একবীজপত্রী না দ্বিবীজপত্রী
কাঁঠালগাছ	জালের মতো	দ্বিবীজপত্রী
গমগাছ		
হলুদগাছ		
জবাগাছ		
ধানগাছ		
কচুরিপানা		
তুলসীগাছ		
লেবুগাছ		
কচুগাছ		
অশ্বত্থগাছ		

তাহলে এবার দেখো তো নীচের উদ্ভিদ রাজ্যের ছকটা বুঝতে পারো কিনা। উদাহরণগুলো তোমরা নিজেরা লিখে ফেলো।

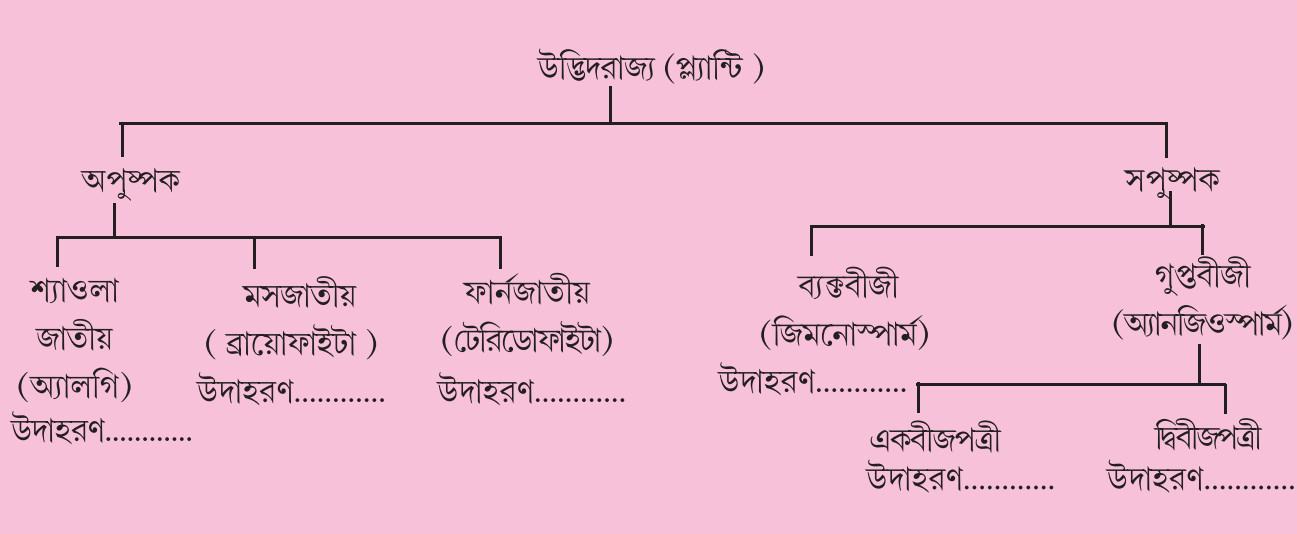

বন্ধনীর ভেতর থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

1. ছোলা হলো একটি ..... (সপুষ্পক/অপুষ্পক) উদ্ভিদ।
2. ধানের খোসাটি ছাড়ালে ..... (1টি/2টি) বীজপত্র দেখা যায়।
3. মটরের খোসাটি ছাড়ালে ..... (1টি/2টি) বীজপত্র দেখা যায়।
4. পাতায় জালের মতো শিরা হলে সেটি .....। (একবীজপত্রী/দ্বিবীজপত্রী)
5. পাতায় মাঝশিরার দু-দিকে সমান্তরালভাবে শিরা থাকলে সেটি .....। (একবীজপত্রী/দ্বিবীজপত্রী)
6. কলাগাছ একটি ..... (একবীজপত্রী/ দ্বিবীজপত্রী) উদ্ভিদ।
7. অশ্বত্থগাছ একটি ..... (একবীজপত্রী/দ্বিবীজপত্রী) উদ্ভিদ।
8. বীজ ফলের মধ্যে থাকলে সেটি ..... (ব্যক্তবীজী/গুপ্তবীজী) উদ্ভিদ।
9. বীজ যদি ফলের মধ্যে না থাকে তখন সেটি (ব্যক্তবীজী/গুপ্তবীজী) উদ্ভিদ।
10. আম একটি ..... (ব্যক্তবীজী/ গুপ্তবীজী) উদ্ভিদ।
11. পাইন একটি ..... (ব্যক্তবীজী/ গুপ্তবীজী) উদ্ভিদ।
12. (মস/ফার্ন)-দের পাতা কচি অবস্থায় কুকুরের লেজের মতো গুটিয়ে থাকে।
13. ..... দের (শ্যাওলা/মস/ফার্ন) দেহে মূল, কাণ্ড, পাতা থাকে না।
14. স্পাইরোগাইরা বা জলরেশম একটি ..... (শ্যাওলা/মস/ফার্ন)।
15. ঢেঁকিশাক একটি ..... (শ্যাওলা /মস/ফার্ন)।

আমরা জীবজগতের মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণীরাজ্য সম্বন্ধে জানলাম। কিন্তু উদ্ভিদ আর প্রাণী ছাড়া আরও কিছু জীব আছে যারা না প্রাণী না উদ্ভিদ। যেমন ধরো তোমাদের বাড়িতে যে দই পাতা হয়, মা-ঠাকুমারা দুধে সাজা দিয়ে দেন। আর দুধ বেশ কিছু সময় বাদে দই হয়ে যায়। এই দইয়ের সাজাতে ব্যাকটেরিয়া বলে যে জীব থাকে, তাদের আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। তারাই দুধকে দই বানিয়ে দেয়।

আবার তোমরা যে টাইফয়েড বা কলেরা রোগের কথা শুনেছ সেইসব রোগের কারণও এই ব্যাকটেরিয়া। সব ধরনের ব্যাকটেরিয়াকে একটি রাজ্যে রাখা হয়। সব ব্যাকটেরিয়ার এই রাজ্যের নাম হলো মোনেরা।

টাইফয়েড রোগের ব্যাকটেরিয়া
(অনেক গুণ বড়ো করে দেখানো)

কলেরা রোগের ব্যাকটেরিয়া
(অনেক গুণ বড়ো করে দেখানো)

আচ্ছা তোমাদের স্কুল বাড়িটায় অনেকগুলো ঘর আছে তো? ছোটো বড়ো অনেক ঘর নিয়েই স্কুল বাড়িটা তৈরি। ঠিক তেমনি আমাদের যে শরীর বা আমাদের চারপাশে যেসব গাছপালা, পশুপাখি দেখি তাদের দেহগুলো ঠিক বাড়ির মতো। অনেক ছোটো ছোটো ঘর বা কুঠুরি নিয়েই আমাদের সবার শরীর তৈরি। তবে সে কুঠুরিগুলো খালি চোখে আমরা দেখতে পাই না। এই কুঠুরিগুলোকে বলা হয় কোশ। অধিকাংশ কোশের মধ্যে একটা গোল মতো বস্তু থাকে যেটাকে আমরা নিউক্লিয়াস বলি।

তবে আমরা যে মোনেরা রাজ্যের ব্যাকটেরিয়ার কথা বলছিলাম তাদের দেহ কিন্তু একটা কোশ দিয়েই তৈরি আর সেই কোশে কিন্তু কোনো নিউক্লিয়াস নেই।

আচ্ছা তোমরা ম্যালেরিয়া রোগের নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। আমাশয় হলে পেটের গোলমাল হয়। আর এইসব ঘটায় একধরনের জীব যাদের শরীরটাও ব্যাকটেরিয়ার মতো একটাই কোশ দিয়ে তৈরি। তবে মজার ব্যাপার হলো এদের কোশের মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে। এইসব নিউক্লিয়াস থাকা একটা কোশের জীবদের যে রাজ্যের মধ্যে রাখা হয় সেটা হলো প্রোটিস্টা।

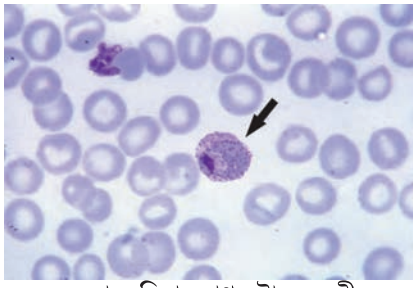

ম্যালেরিয়া রোগ ঘটায় যে জীব
(অনেক গুণ বড়ো করে দেখানো)

আমাশয় রোগ ঘটায় যে জীব
(অনেক গুণ বড়ো করে দেখানো)

নীচের ছবি দুটো দেখো। দুটো ছবিই অনেকগুণ বড় করে দেখানো। প্রথমটা হলো ইউগ্লিনা ও দ্বিতীয়টা প্যারামেসিয়াম। এরাও প্রোটিস্টা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

বর্ষাকালে তোমাদের বাড়ির আশেপাশে ব্যাঙের ছাতা তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। অনেকসময় খড়ের গাদায়ও হয়। এদের মাশরুমও বলে। অনেক মাশরুম খাওয়া হয়, আবার অনেক জাতের মাশরুম খাওয়া হয় না কারণ তারা বিষাক্ত। পাঁউরুটি বেশ কয়েকদিন রেখে দিলে কালো-সবুজ ছাতা পড়ে যায়, নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ। লেবু পচে গেলে তার গায়েও এরকম নীলচে-সাদা ছাতা পড়ে। এগুলো সবই ছত্রাক। অনেক সময় আমাদের কারো কারো গায়ের চামড়ায় যে দাদ হয়, প্রচুর চুলকায় বা মাথায় খুসকি হয় সেগুলো সবই নানা ধরনের ছত্রাক।

তবে এই ছত্রাকরা গাছেদের মতো সবুজ নয়। এরা নিজেদের দেহে খাবার তৈরি করতে পারে না। সমস্ত ছত্রাকদের একটা রাজ্যে রাখা হয়। তার নাম ফানজাই ।

তোমার দেখা যে-কোনো একটি পুকুরে,বনে,বাড়ির আশেপাশে, তীরবর্তী সমুদ্রে, অ্যাকোয়ারিয়ামে কিংবা ঘাসজমিতে বিভিন্ন মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের নামের তালিকা তৈরি করো।

অমেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডী
1. চিংড়ি	1. মাছ
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

অমেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডী
1. প্রজাপতি	1. হরিণ
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

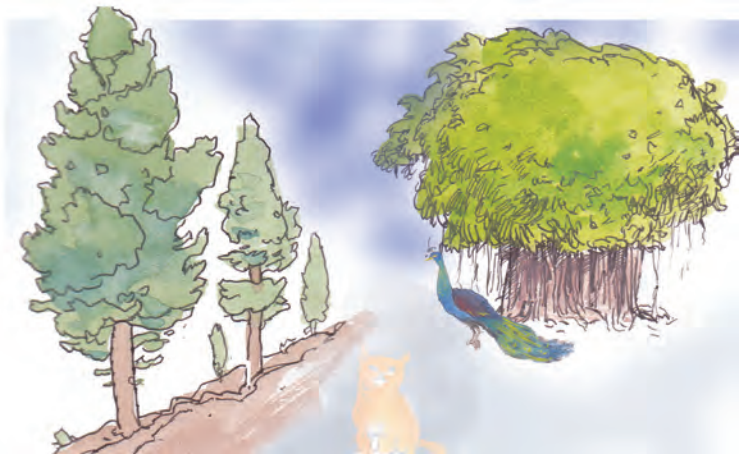

অমেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডী
1. কেঁচো	1. কুনোব্যাং
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

অমেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডী
1. জেলিফিশ	1. হাঙর
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

অমেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডী
1. শামুক	1. গোল্ডফিশ
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

অমেরুদণ্ডী	মেরুদণ্ডী
1. পিঁপড়ে	1. সাপ
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

11 কতকগুলি বিশেষ প্রাণীর বাসস্থান ও আচার-আচরণ

আচরণ বিজ্ঞান আর আচরণ বিজ্ঞানী

সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসেছ। পড়ার ফাঁকে হঠাৎ নজর চলে গেল ঘরের দেয়ালের টিকটিকিটার দিকে। আলোর কাছাকাছি সে ঘাপটি মেরে বসে আছে। আলোর আকর্ষণে এসে কোনো পোকা যদি তার মুখের সামনে পড়ে যায়। তাহলে দেখবে কেমন কপাৎ করে তাকে ধরে গিলে ফেলেছে। কখনও আবার, কোনো ফড়িং বা পোকা একটু দূরে কোথাও বসেছে, টিকটিকিটা কেমন পা টিপে টিপে অতি সাবধানে একটু একটু করে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘপাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরে ফেলেছে।

কিংবা, তুমি হয়তো ছুটির দিনের দুপুরবেলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছ। হঠাৎ খোলা জানালা দিয়ে চোখে পড়ল সামনের গাছটার ডালে বাসা তৈরি করেছে দুই কাক। একটা কাক বাসার মধ্যে বসে আছে— সেটা হয়তো মা-কাক, ডিমে তা দিচ্ছে। অন্য কাকটা বাবা-কাক যে মাঝে মাঝে খাবার নিয়ে আসছে। মা-কাকটাকে খাইয়ে দিচ্ছে। একবার দেখলে মা-কাকটা বাসা ছেড়ে উঠে এল। ওমা! তুমি দেখলে ডিম না, দুটো বাচ্চা রয়েছে বাসাতে। গায়ে পালক নেই তাদের, বড়ো হাঁ করে দুজনে খুব চ্যাঁ চ্যাঁ করতে থাকল। মুখের ভিতরটা একদম লাল। বাবা-কাক এবারে খাবার ঢেলে দিতে দুজনের মুখের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে দিল।

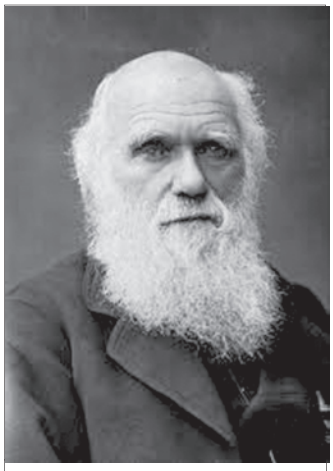

চার্লস ডারুইন

এরকম তো অনেক কিছুই তোমরা দেখো তোমাদের চারপাশে, তোমাদের ভালোই লাগে নিশ্চয়। কিন্তু, তোমরা কি জানো— জীবজন্তু, পোকামাকড়ের আচার-আচরণ বিজ্ঞানীরা খুঁটিয়ে দেখেন গবেষণা করবার জন্য। এই ধরনের গবেষণাকে বলা হয় আচরণ বিজ্ঞান। ইংরাজিতে Behavioural Science।

মানুষ তো আদিম কাল থেকেই জীবজন্তুর আচার-আচরণ দেখে এবং সেই নিয়ে ভাবে। নইলে তারা কীভাবে বনের পশুকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পশুতে পরিণত করেছিল, কোন মাছকে কীভাবে ধরা যাবে তার উপায় বের করেছিল! কিন্তু আধুনিককালে যাঁরা জীবজন্তু পোকামাকড়দের আচরণ খুঁটিয়ে দেখেছেন তাঁদের মধ্যে আগে দুজনের নাম করতে হবে। এরা হলেন— চার্লস ডারুইন আর জঁ আঁরি ফ্যাবা। ডারুইন ইংল্যান্ডের আর ফ্যাবা হলেন ফ্রান্সের মানুষ। ডারুইন ছোটোবেলা থেকেই পোকামাকড়, পাখি এদের আচার-আচরণ দেখেন। পরে বড়ো হয়ে তিনি জাহাজে করে ঘোরার সময় অন্য নানা জায়গার জীবদের আচার-আচরণ দেখেন। সেইসব নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করে উনি একটা বই লেখেন। সেই বইয়ে ব্যাখ্যা করেন জীবরা কীভাবে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে এবং একধরনের প্রজাতি থেকে কিভাবে নতুন ধরনের প্রজাতি সৃষ্টি হয়। তাঁর এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর নির্ভর করে আধুনিক জীব বিজ্ঞানের পড়াশোনা ও গবেষণা হয়।

জঁ আঁরি ফ্যাবা

ফ্যাবা ছিলেন গরিব ঘরের সন্তান। খুব কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে উনি স্কুল শিক্ষক হন। তাঁর নেশা ছিল বাড়ির বাগানে ও তার আশেপাশে নিয়মিত দেখতে পাওয়া পোকামাকড়দের আচার-আচরণ খুব মন দিয়ে দেখা এবং সে সম্বন্ধে সুন্দর করে লেখা। পোকামাকড়দের নিয়ে তাঁর লেখাগুলো এত ভালো আর এত বড়ো যে তাকে পোকামাকড়দের মহাকাব্য বলা হয়। পোকামাকড়দের নিয়ে ফ্যাবা-র অনেক সুন্দর লেখা আছে। তার মধ্যে একটা বিখ্যাত লেখা হলো একধরনের শুঁয়োপোকাদের সারিবদ্ধভাবে চলবার একগুঁয়ে স্বভাব নিয়ে। এই শুঁয়োপোকাদের একজনের ঠিক পিছনে আর একজন একইভাবে চলে। একদম সামনে যে থাকে সে যে দিকেই যাক, সেই দিকেই শুঁয়োপোকাদের লাইন যাবে। ঠিক যেন রেলগাড়ি। ফ্যাবা এদের এই একগুঁয়েমি কতটা তা দেখবার জন্য একবার একটা পরীক্ষা করলেন। শুঁয়োপোকাদের লাইনটাকে কাঠি দিয়ে তুলে একটা গোল টবের কানায় বসিয়ে দিলেন। ওরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা টবের কানা ধরে চক্রাকারে ঘুরতে থাকল। ফ্যাবা দেখেছিলেন ক্লান্তিতে যতক্ষণ না পর্যন্ত খসে পড়ে যাচ্ছে ততক্ষণ শুঁয়োপোকারা ঘুরতেই থাকে। তাদের শরীরের ভিতর থেকে স্নায়ুতন্ত্রে যেন নির্দেশ যাচ্ছে - সামনে চলো, অন্য কোনো দিকে তাকিও না, সরো না।

কনরাড লোরেঞ্জ

বিজ্ঞানী ডারুইন আর ফ্যাবা-র এই আধুনিক আচরণ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উত্তরসূরি বলে ধরা হয় তিনজন বিজ্ঞানীকে। এঁরা হলেন- নিকো টিনবারজেন, কনরাড লোরেঞ্জ আর কার্ল ফন ফ্রিশ। টিনবারজেনের অনেক বিখ্যাত গবেষণার মধ্যে বিখ্যাত আবিষ্কার হলো- পাখিদের বোকামি। হেরিং গাল নামের পাখিরা মাটিতে ডিম পাড়ে ও তা দেয়। পরীক্ষা করার জন্য তাদের বাসার পাশে আসল ডিমের থেকে অনেক বড়ো, বেশি চকচকে ডিম রেখে দিলে, মা বা বাবা পাখি তাড়াতাড়ি আসল ডিম ছেড়ে সেই নকল ডিমে তা দিতে চেষ্টা করে। লোরেঞ্জ দেখেছিলেন- হাঁস ডিম ফুটে বেরোবার সময় যাকে সামনে দেখে তাকেই মা বলে ভেবে পুরো ছেলেবেলাটা তার পিছন পিছন ঘুরে কাটায়। এমনকি ডিম ফুটে বেরোনোর সময় যদি মা-এর হলুদ ঠোঁটের মতো দেখতে একটা রং করা কাঠের টুকরোও বাচ্চাদের দেখানো হয়, তবে তারা ওই কাঠের টুকরোটা দেখলেই মা ভেবে প্যাঁক প্যাঁক করতে করতে ছুটে যায়।

কার্ল ফন ফ্রিশ

বিজ্ঞানী ফন ফ্রিশ আবিষ্কার করেছিলেন মৌমাছির নাচের ভাষা। কোনো জায়গায় ভালো মিষ্টি রস ভরা ফুল দেখে শ্রমিক মৌমাছি মৌচাকে ফিরে আসে বাকি সঙ্গী শ্রমিকদের খবর দেওয়ার জন্য যাতে ওই মিষ্টি রস মধু তৈরির জন্য সবাই মিলে নিয়ে আসতে পারে। যে মৌমাছিটি খবর এনেছে সে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গিতে চাকের উপর নেচে সঙ্গীদের বুঝিয়ে দেয় কোনদিকে কতদূরে সেই রসভরা ফুলেরা আছে। টিনবারজেন, লোরেঞ্জ আর ফন ফ্রিশ-কে তাঁদের গবেষণার কৃতিত্বের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

জেন গুডাল

জেন গুডাল প্রথম মহিলা যিনি বন্য শিম্পাঞ্জিদের আচার-আচরণ কীরকম তা জানবার

জন্য আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে একা দিনের পর দিন কাটিয়েছেন। তিনিই প্রথম আমাদের জানান যে শিম্পাঞ্জিরা কাঠি দিয়ে উইপোকা খুঁচিয়ে বার করে খায়- ঠিক মানুষরা যেমন ছিপ দিয়ে মাছ ধরে সেরকম। শিম্পাঞ্জিরা বন্য অবস্থাতেও যে প্রায় মানুষের মতো আচার-আচরণ করে তা জানা গেছে তাঁর গবেষণা থেকে।

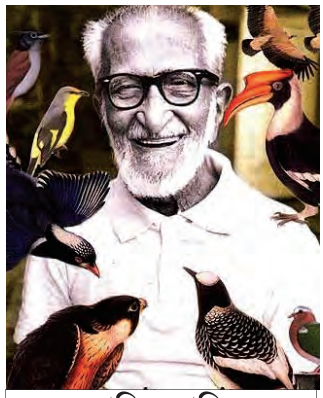
সালিম আলি

অনেক ভারতীয় বিজ্ঞানীও জীবজন্তুর আচার-আচরণ নিয়ে গবেষণা করে বিখ্যাত হয়েছেন। সালিম আলি ভারতীয় পাখিদের আচার-আচরণ নিয়ে লিখেছেন। রাঘবেন্দ্র গাডাগকার গবেষণা করেন বোলতাদের সমাজ ব্যবস্থা কীরকম সেবিষয়ে। এম.কে চন্দ্রশেখর বাদুড় এবং অন্যান্য অনেক প্রাণীর শরীর কীরকম সময় মেনে কাজ করে গবেষণা করে তা জেনেছেন। রতনলাল ব্রহ্মচারীর গবেষণায় জানা গেছে বাঘরা কীভাবে মূত্রের মধ্যে গন্ধ (ফেরোমোন) মিশিয়ে নিজের এলাকা চিহ্নিত করে তার কথা।

সবশেষে তোমাদের জানাব গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কথা। সারা জীবন উনি বাংলার পোকামাকড়দের আচার-আচরণ খুঁটিয়ে দেখেছেন, তাদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তারপর সেইসব গবেষণার কথা বাংলা ভাষায় সহজ-সুন্দরভাবে সবার জন্য লিখেছেন। তাঁর 'বাংলার কীটপতঙ্গ' বইটি সবথেকে বিখ্যাত। তোমরা সুযোগ পেলেই সেটি পড়ে ফেলবে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য-র লেখা থেকে কিছু আকর্ষণীয় অংশ

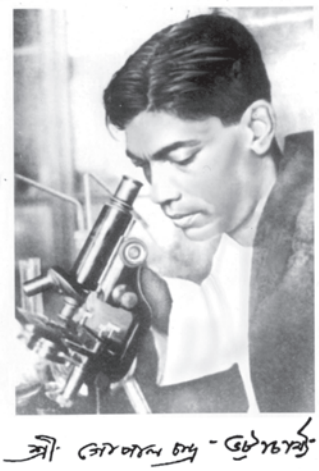

এক দিন সকাল নটা, সাড়ে-নটার সময় পল্লিঅঞ্চলের রাস্তা দিয়ে চলেছি। সকাল থেকেই শিশিরবিন্দুর মতো গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। কিছু দূর অগ্রসর হতেই রাস্তার এক পাশে পরিষ্কার স্থানেই একটা সুপারি গাছের উপর নজর পড়ল। কতকগুলি নালসো (লাল পিঁপড়ে) সার বেঁধে গাছটার উপরের দিক থেকে নীচের দিকে ছুটে আসছিল। অবশ্য দু-চারটা পিঁপড়ে উপরের দিকেও উঠছিল। নালসোরা সাধারণত গাছের উপরেই চলাফেরা করে, নেহাত প্রয়োজন না হলে মাটিতে বা নীচু জায়গায় বড়ো একটা নামতে চায় না। তাছাড়া সুপারি গাছের উপর এদের সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় না। কাজেই ব্যাপারটা কী দেখবার জন্যে কৌতূহল হলো। কাছে গিয়ে দেখলাম — গাছটার এক পাশে মাটি থেকে প্রায় এক ফুট উপরে, কালো রঙের একদল ক্ষুদে পিঁপড়ে ছোট্ট একটা গুবরে পোকাকে আক্রমণ করে নীচে নামবার জন্যে তার ঠ্যাং ধরে প্রাণপণে টানাটানি করছে। উপর দিক থেকে আবার পাঁচ-ছয়টা নালসো তার সামনে দুটা পা ও ঘাড় ধরে এমনভাবে টান হয়ে রয়েছে যেন আর একটু হলেই ছিঁড়ে যাবে। গুবরে পোকাটার কাছ থেকে নীচের দিকে গাছটার গোড়ার উপর এখানে-সেখানে আরও অসংখ্য ক্ষুদে পিঁপড়ে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছিল। সুপারি গাছটা প্রকাণ্ড একটা আমগাছের উপর হেলে পড়েছিল। আম গাছটাতেই ছিল নালসোদের বাসা। সেখান থেকে সুপারি গাছটার উপর দিয়ে দু-একটা টহলদার পিঁপড়ে নীচের অবস্থা তদারক করতে আসায় হয়তো শিকারটা নজরে পড়ে যায়। তার ফলেই খুব সম্ভব উভয় দলে শক্তি পরীক্ষা চলেছে। লক্ষণ দেখে বোধ হলো — ক্ষুদেরাই প্রথম শিকারটাকে আক্রমণ করে তাকে অনেকটা কাবু করে এনেছিল — তারপর এসেছে এই নালসোর দল। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই যে এই কাণ্ডটা চলছিল, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু উভয় পক্ষের টাগ-অব-ওয়ারটা চলছে অল্পক্ষণ ধরে। এদিকে-ওদিকে দু-চারটা খাড়া পাহারা মোতায়েন করেছে মাত্র। এই পাহারাদার সান্ত্রীরা শুঁড় উঁচিয়ে, মুখ হাঁ করে, নিশ্চলভাবে অপর পক্ষের গতিবিধির দিকে লক্ষ রেখেছে। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে বাকি রইল না যে, শীঘ্রই একটা গুরুতর 'পরিস্থিতি'-র উদ্ভব হবে।

তোমরাও এবার থেকে ডারুইন, ফ্যাবা, গোপালচন্দ্রের মতো চারপাশে পোকামাকড় পশু-পাখিদের আচার-আচরণ দেখতে শুরু করো। শুধু দেখলে হবে না, যা দেখলে তা একটা খাতায় তারিখ এবং সময় দিয়ে লিখে রাখো। কে জানে যে তুমিও একদিন ওঁদের মতো বড়ো আচরণ বিজ্ঞানী হয়ে উঠবে না! অবশ্য তার জন্য আরো পড়াশোনা ও গবেষণাও করতে হবে।

বাচ্চার হাতের লেখায় Naturalist diary -র উদাহরণ

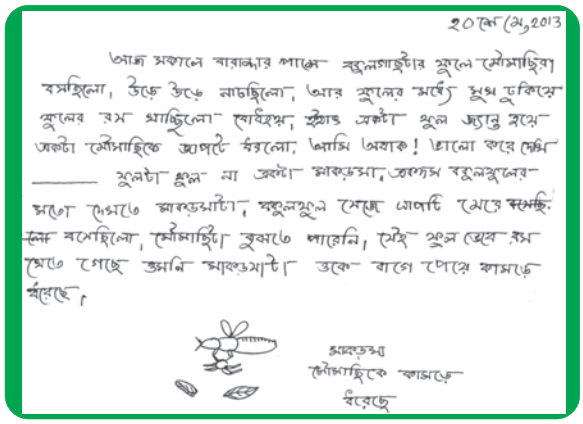

কতকগুলি বিশেষ প্রাণীর আচার-আচরণ

পিঁপড়ে

সবাই জানে পিঁপড়েরা সমাজবদ্ধ জীব। পৃথিবীতে অনেক জাতের পিঁপড়ের খবর জানা আছে। কিন্তু আরও অনেক জাতের পিঁপড়ে আছে, যাদের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা একটা হিসাব করেছেন -এ পৃথিবীতে সব জাতের সবকটা পিঁপড়েকে যদি একটা দাঁড়িপাল্লার একটা দিকে বসিয়ে আর একদিকে যদি বাকি সব জাতের প্রাণীদের সব্বাইকে বসানো যায়, পিঁপড়ের পাল্লা নেমে যাবে অনেকখানি। মানে, সংখ্যায় পিঁপড়েরা পৃথিবীর অন্য যে-কোনো প্রাণীর থেকে এত বেশি। বিজ্ঞানীরা বলেন পিঁপড়ে সমাজে এক রানি, রানির অসংখ্য দাসী, সৈন্য আর শ্রমিক নিয়ে একেকটা পরিবার। দাসী, সৈন্য আর শ্রমিক সবাই কিন্তু আসলে রানির মেয়ে। পিঁপড়ের পরিবারে পুরুষের সংখ্যা বা গুরুত্ব খুবই কম। পিঁপড়েরা সব আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করতে পারে।

বিজ্ঞানীরা বলেন পিঁপড়ের দলে লাল পিঁপড়ের দল হলো মনিব আর কালো পিঁপড়ের দল হলো তাদের সেবক। লাল পিঁপড়েরা যুদ্ধে পটু। তুলনায় কালো পিঁপড়েরা অনেক বেশি বুদ্ধিমান। কঠোর পরিশ্রমীও বটে। লাল পিঁপড়েদের মধ্যে মাঝে মাঝেই খাবার মজুত করার চাপ বেড়ে যায়। তখন কালো পিঁপড়েদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধায়। কালো পিঁপড়েরা হেরে গিয়ে মারা যায়। তখন লাল পিঁপড়েরা ওদের বাসায় গিয়ে ডিম মুখে করে নিজের বাসায় নিয়ে আসে। বড়ো হয়ে এরা লাল পিঁপড়েদের জন্য সারাজীবন বেগার খেটে মরে। শীতের দিনে পিঁপড়েদের খুব একটা বেশি দেখা যায় না। তখন তারা মাটির নীচে ঘর বেঁধে থাকে আর মজুত খাদ্য খায়। গরম দেশে যাযাবর পিঁপড়ে দেখা যায়। এরা অনবরত বাসা বদল করে। চাষি পিঁপড়েরা মাটিতে গর্ত করে বাসা বানায়, এদের বাসায় কাটা পাতা পচে গেলে তার ওপর একধরনের সাদা রঙের ছত্রাক জন্মায়। এই ছত্রাক চাষি পিঁপড়েদের খুব প্রিয় খাবার। কীভাবে বছরের পর বছর ধরে এই ছত্রাকের চাষ করে তা এক অবাক করা বিষয়। একধরনের পিঁপড়ে আছে যাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের পেটটাকে পরিবারের খাবার জমিয়ে রাখার জালা হিসাবে ব্যবহার করে।

করে দেখো

স্থান : বাড়ি এবং চারপাশের পরিবেশ

উপকরণ : নোটবই, পেন, লেন্স

সময়কাল : প্রধানত গরমকাল

তোমরা 10 - 20 জনের একটা দল বাড়ি ও আশেপাশের পিঁপড়েদের ভালোভাবে লক্ষ করো এবং নীচের সারণিটি পূর্ণ করো:

ক্রমিক নং	পিঁপড়ের নাম জানা না থাকলে তোমরাই চরিত্র অনুযায়ী ওদের একটা নাম দাও	রং			আকার			বাসস্থান
		লাল মাথার রং	বাদামি মাঝের অংশের রং	কালো পেটের রং	ছোটো (1-4 mm)	মাঝারি (5-10 mm)	বড়ো (10 mm বা তার বেশি)	

করে দেখো

স্থান: বাগান

উপকরণ : একটি মার্কার পেন, নোটবুক, পেন, ঘড়ি।

পিঁপড়ে যাওয়ার পথে 10 সেমি অন্তর কয়েকটা দাগ টানো। লক্ষ করো এই দূরত্ব পার হতে কোনো পিঁপড়ের কত সময় লাগছে? ..... ।

আরও লক্ষ করো।

- পিঁপড়ের বাসাটা কোথায় — মাটির তলায়, দেয়ালের ফাঁকে। ..... ।
- বাসা থেকে বেরোনোর পর কীভাবে কোনদিকে পিঁপড়েরা রওনা দেয়? ..... ।
- বাসা থেকে বেরিয়ে দলবেঁধে না একা একা যাচ্ছে? ..... ।
- বাসা থেকে বেরিয়ে সবসময় কি একই দিকে বা একই গন্তব্যস্থলে যায়? ..... ।

করে দেখো

স্থান : বাড়ি ও চারপাশ

উপকরণ : নানা ধরনের খাদ্য, লেন্স, নোটবই, পেন।

তোমরা 10 - 20 জনের একটা দল মাটিতে কিছু পরিমাণ আমিষ বা নিরামিষ; তরল বা কঠিন খাদ্য রেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। তারপর দেখো কোন ধরনের পিঁপড়েরা এল। তারপর নীচে লেখো :

ক্রমিক নং	খাদ্যের ধরন	কোন জাতের পিঁপড়ে এল	তারা কীভাবে খাবার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে
1.			
2.			
3.			

করে দেখো

যখন একদল পিঁপড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় তখন তাদের লক্ষ করে নীচের সারণিটি পূরণ করো। এর থেকে তুমি কী সিদ্ধান্তে আসতে পারো?

পিঁপড়ের দলের প্রকার ভেদ	আনুমানিক সংখ্যা
1. বড়ো চোয়ালওয়ালা পিঁপড়ে এবং গাঢ় বর্ণের	
2. অপেক্ষাকৃত বড়ো আকারের, পেট বেশ লম্বা এবং ডানাযুক্ত	
3. ডিম বহনকারী পিঁপড়ে	
4. খাদ্য বহনকারী পিঁপড়ে	

করে দেখো

তোমার বাড়ির উঠোনে বা বাগানে এক টুকরো গুড়/বাতাসা/নকুলদানা/ চিনির দ্রবণ কিংবা পোকামাকড় রেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। ভালো করে দেখো। তারপর নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খাতায় লিখে ফেলো।

- খাবার রাখার কতক্ষণ পরে প্রথম পিঁপড়ে খাবারের আশেপাশে দেখা যায়? .....
- খাবার দেখে সে কি প্রথমেই খেতে শুরু করে না অন্য কিছু করে? .....
- কখন এবং কীভাবে অন্য পিঁপড়েরা খাদ্যের দিকে আনাগোনা শুরু করে? .....
- কোন ধরনের পিঁপড়েরা খাবার নিয়ে যেতে আসে? .....
- একা না দলবেঁধে তারা বাসায় খাবার নিয়ে যায়? .....
- বিভিন্ন খাদ্য খেতে কী ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পিঁপড়েরা আসে? .....
- খাদ্য নিয়ে তারা কী নিজেদের মধ্যে লড়াই করে না ভাগাভাগি করে খায়/ নিয়ে যায়?

উইপোকা

উইপোকারাও পিঁপড়ে বা মৌমাছিদের মতো সমাজবদ্ধ জীব। কিন্তু তাদের মধ্যে রানির ছেলে ও মেয়েরা দুজনেই দাস-দাসী, সৈন্য বা শ্রমিক হতে পারে। উইরানি বেজায় মোটা হয়। সারা শরীরে ডিম-বোঝাই পেট ছাড়া আর কিছু প্রায় চোখেই পড়ে না। উইদের গায়ে অন্য পোকাদের মতো কোনো শক্ত খোলা থাকে না। ফলে, বেশিক্ষণ রোদ তাপ লাগলে শরীর থেকে জল বেরিয়ে শরীর শুকিয়ে যায়। উইরা তাই গর্তের বাইরে এসে ঘুরে বেড়ায় না। কোথাও যেতে গেলে সুড়ঙ্গ বানাতে বানাতে তার মধ্যে দিয়ে এগোয়। দেয়ালে বা জানালা-দরজার ফ্রেমে উইদের সুড়ঙ্গ দেখোনি? আবার, উইদের গর্তে তাপমাত্রা আর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যাতে খুব বেড়ে-কমে না যায় তার ব্যবস্থাও থাকে। তবে সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হলো উইদের খাবার। গাছের কাঠ অংশ, যাতে, সেলুলোজ নামের শর্করা বস্তু থাকে - তা' কোনো প্রাণীই হজম করতে পারে না, কিন্তু উইরা পারে। তার কারণ, উইদের পেটে একরকম জীবাণু থাকে যারা সেলুলোজ হজম করতে পারে। তা যদি না হতো, পৃথিবীর যত গাছ মরে কাঠ হয়ে গেছে, তার বেশিরভাগটাই চিরদিন কাঠ হয়ে থেকে যেত।

করে দেখো

স্থান: উন্মুক্ত ফাঁকাস্থান/বাড়ির চারপাশ/বিদ্যালয়ের আশেপাশে।

উপকরণ: কাগজ, কলম, পেনসিল, লেন্স, ডিশ, সাধারণ পিন।

তোমরা 5-20 জনের একটা দল উই-এর ঢিপি বা সুড়ঙ্গ খুঁজে পেলে ভালো করে লক্ষ করো। তারপর নীচের টেবিলটি পূরণ করার চেষ্টা করো।

কোথায় উইদের দেখা পেলে?

সেই স্থানের বৈশিষ্ট্য				কেমন মাটি	
মাটির ওপরে	মাটির নীচে	পাথরের গায়ে	গাছের গুঁড়িতে	শুকনো	ভিজে

আচ্ছা উই-এর ঢিপি বা সুড়ঙ্গ দেখে কি এর সঙ্গে আশেপাশের গাছপালার কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হচ্ছে? (সঠিক উত্তরটির পাশে '√' দাও)

কোনটাতে উই বেশি ধরে খুঁজে দেখো।

(a) বড়ো গাছের বাকল/ সবুজ অংশ/ চারাগাছ /গাছের ডাল

(b) মৃত গাছের গুঁড়ি/ কাঠের দরজা-জানালা (পালিশ করা)

করে দেখো

স্থান : গ্রামের আশেপাশে।

উপকরণ : খাতা, কলম, পেনসিল, মাপার ফিতে

তোমরা কোনো উই-এর ঢিপি দেখতে পেলে শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্যে নীচের তথ্যগুলি সংগ্রহ করার চেষ্টা করো।

1. ঢিপির উচ্চতা কত? .....
2. ঢিপির মাটির বৈশিষ্ট্য কী ? .....
3. ঢিপির বাইরের দিক কীরকম? .....
4. ঢিপিকে ঘিরে থাকা চারপাশের পরিবেশ কীরকম? .....
5. ঢিপির ছবি আঁকো।

করে দেখো

স্থান : বাড়ি, খেলার মাঠ বা চারপাশের বাগান।

উপকরণ : খাতা, কলম, পেনসিল, একটা লাঠি , লম্বা একটা শক্ত কাঠি, স্বচ্ছ বোতল।

তোমরা 5-20 জনের একটা দল উই -এর ঢিপি খুঁজে পেলে কাছাকাছি যাও। তোমাদের কেউ কেউ ঢিপির একটা বা দুটো চুড়ো লাঠি দিয়ে ভেঙে ফেলো। তারপর এক বা দু-দিন ধরে নীচের সূত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করে খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

1. ঢিপি ভাঙার পর তুমি কী দেখলে? .....
2. ঢিপির ক্ষত মেরামত করার জন্য উইপোকারা কোথা থেকে মাটি আনে? .....
3. ঢিপির মধ্যে যদি উইপোকা না থাকে তবে ঢিপির ভিতরের গঠনের ছবি আঁকতে চেষ্টা করো।
4. ঘড়ি ধরে দেখো সারাতে কতক্ষণ লাগে , কীভাবে সারাচ্ছে, যারা সারাচ্ছে তাদের গঠন লক্ষ করো।
5. সরু কাঠি ভাঙা গর্ত দিয়ে ঢুকিয়ে 1-2 মিনিট ধরে রাখো, তারপর আস্তে আস্তে বের করে আনো। দেখো উইপোকারা কী করছে কাঠিটাতে?
6. কাঠির গা কামড়ে ধরে থাকা উইপোকাদের একটি স্বচ্ছ বোতলে সংগ্রহ করে নীচের বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করো।

(a) আকার:

(b) রং :

(c) চোয়াল :

(d) উদর :

মৌমাছি

মৌমাছি কিন্তু মাছি নয়। তাদের মাছির মতো দুটো ডানা না, চারটে ডানা। তারা বরং বোলতা আর পিঁপড়েদের আত্মীয়। ফুলের মধ্যে যে মিষ্টি রস হয় তাকে বলে নেকটার। সেই রস তারা নিজেদের বাসায় আনে। একে মৌ বা মধু বানিয়ে জমিয়ে রাখে বলে এদের নাম মৌমাছি। এদের বাসাকে বলে মৌচাক। মৌমাছিরা একা একা থাকে না, একসঙ্গে সবাই মিলে একেকটা পরিবার হিসাবে থাকে। তাই এরা সামাজিক জীব। একেকটা মৌচাকে একেকটা পরিবার। রানি মৌমাছি আর শ্রমিক মৌমাছি - যারা রানির মেয়ে কিন্তু সংসারের সব কাজ করে - তারাই পরিবারের সব। মৌমাছি সমাজে পুরুষদের সংখ্যা ও ভূমিকা খুবই কম। মেয়ে শ্রমিকরা রানির যত্ন নেয়। নিজেদের গা থেকে ঘামের মতো বেরোনো মোম জমিয়ে মৌচাক তৈরি করে। ঘুরে ঘুরে ফুল থেকে নেকটার বা মিষ্টি রস এনে মৌচাকের কুঠুরিতে মধু করে জমিয়ে রাখে। সবাইকে খাওয়ায়। মৌচাকের কুঠুরি গরম হয়ে গেলে পাখা নাচিয়ে বাতাস করে ঠান্ডা রাখে। মৌচাক মোম দিয়ে তৈরি। খুব বৃষ্টি হলে মোম ভিজে যায়। এতে অনেক বাচ্চা মৌমাছি মারা যায়। তখন শ্রমিক মৌমাছিরা জোরে জোরে বাতাস করলে ভেজা বাসা শুকিয়ে যায়। আবার, শত্রু এলে ঝাঁপিয়ে পড়ে হুল ফুটিয়ে দেয়। সেই হুল একদিকে খাঁজ কাটা অন্যদিকে নিজেদের পেটের সঙ্গে এমনভাবে আটকানো যে শত্রুর শরীরে হুল ঢুকলে সেটা তাদের পেট থেকে ছিঁড়ে আটকে থাকে। ফলে শ্রমিক মৌমাছি মারা পড়ে। মধু যেমন খেতে ভালো, তেমনি উপকারী। মানুষ তো বটেই, অন্যান্য অনেক প্রাণীই মৌচাক ভেঙে মধু খেতে ওস্তাদ। মানুষ অবশ্য অনেক কাল আগে থেকেই মৌমাছিকে পোষ মানিয়ে বাক্সে মৌচাক তৈরি করাতে শিখেছে যাতে ইচ্ছেমতো মধু পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে বড়োজোর দশ-এগারো জাতের মৌমাছির খবর জানা আছে। আমাদের দেশে আছে তিন-চার জাতের। মজার কথা, আমেরিকা মহাদেশে কোনো মৌমাছি ছিল না। ইউরোপের মানুষ প্রথম সেখানে মৌমাছিদের নিয়ে গিয়েছিল।

করে দেখো

স্থান : বাগানের আশেপাশে।

সময় : ফুল ফোটার ঋতুতে।

উপকরণ : খাতা, পেনসিল।

তোমরা নিজেদের মধ্যে (1-20 জনের দল) বিভিন্ন সময়ে দেখা মৌচাক নিয়ে আলোচনা শুরু করো। তারপর বিভিন্ন মৌচাক দেখতে পেলে পর্যবেক্ষণ করে নীচের তথ্যসারণিটি পূরণ করো।

ক্রমিক সংখ্যা	মৌচাকের ধরন	মৌচাকের আকার		কোনখানে মৌচাকটি দেখা গেছে
		লম্বা	চওড়া	
1.				
2.				
3.				
4.				

5. করে দেখো

এবার কোনো মৌচাক দেখতে পেলে তোমরা নীচের তথ্যগুলি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করো।

- বছরের কোন কোন সময় এই ধরনের মৌচাক দেখা যায়? .....
- আশেপাশে লক্ষ করে লেখো কোন কোন গাছে ফুল ফুটে আছে? .....।
- এর মধ্যে কোন কোন গাছের ফুল থেকে মৌমাছি নেকটার বা মিষ্টি রস সংগ্রহ করছে? .....।

করে দেখো

যদি তুমি কোনো পরিত্যক্ত মৌচাক খুঁজে পাও তবে তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করো, সংগ্রহ করার পর নীচের তথ্যগুলি জানার চেষ্টা করো। (শব্দভাণ্ডার- মোম, ভেতরের কুঠুরিতে, ডানদিকের কুঠুরিতে, বাম ও নীচের দিকের কুঠুরিতে, ষড়ভুজাকৃতি, মাঝের কুঠুরিতে)

- কোন কোন উপাদান দিয়ে মৌচাকটি তৈরি হয়েছে? .....
- মৌচাকের কুঠুরিগুলির আকৃতি কেমন? .....
- মৌচাকের কোথায় মধু সঞ্চয় করা হতো? .....
- মৌচাকের কোথায় ডিমগুলি সঞ্চয় করা হতো? .....
- রানি মৌমাছির থাকার কুঠুরি কোনদিকে থাকে? .....
- পুরুষ ও শ্রমিক মৌমাছির লার্ভারা মৌচাকের কোথায় থাকে? .....
- মৌচাকের একটি ছবি এঁকে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করো।

করে দেখো

স্থান : বাড়ির আশেপাশের বাগান।

উপকরণ : হলুদ ও লাল কাগজ, চিনির দ্রবণ, জল, দুটো ডিশ।

- তোমরা 1-5 জনের এক একটি দল তোমার অঞ্চলে কোনো সক্রিয় মৌচাক থাকলে চিহ্নিত করো।
- তারপর মৌচাক থেকে 40-50 ফুট দূরত্বে হলুদ কাগজের ওপর চিনির দ্রবণ ভরতি ডিশটা রাখো।

এবার লক্ষ করো।

- ক-বার মৌমাছিরা ওই চিনির দ্রবণ দেখতে এল? .....
- চিনির দ্রবণ খাওয়ার সময় তারা কী কী করল? .....
- হলুদ কাগজের রং বদলে লাল দিলে কী ঘটনা ঘটে? .....

শ্রমিক মৌমাছি যখন ফুলে রস খেতে আসে, সেসময় খেয়াল করে দেখো পিছনের পায়ে হলুদ-হলুদ গুঁড়ো লেগে আছে কিনা । মৌমাছিরা ফুলে ফুলে রস খাওয়ার জন্য যখন ঢোকে তখন এক গাছের ফুলের পরাগ একই জাতের অন্য গাছের ফুলে নিয়ে যায়। এজন্য ফুলে পরাগমিলন ঘটে এবং ফুল ফলে পরিণত হয়।

হাতি

পৃথিবীর স্থলভাগে যত প্রাণী ঘুরে বেড়ায় তাদের মধ্যে সবথেকে বড়ো আকারের হলো হাতি। ভারতবর্ষে যে হাতিরা থাকে তাদের একেকটার ওজন কম করে দু-হাজার কিলোগ্রাম, মাটি থেকে মাথা পর্যন্ত এগারো ফুট উঁচু হতে পারে । আফ্রিকার হাতিরা আরও উঁচু আরও ভারী। হাতির দেহে সবথেকে মজার অঙ্গ হলো তার শুঁড়। নাক আর উপরের ঠোঁট জোড়া লেগে লম্বা হয়ে শুঁড় তৈরি হয়েছে। তবে শুঁড় দেখতে মজার হলে কী হবে, ভীষণ কাজের। উপরে তুলে বাতাসে গন্ধ শোঁকা, গাছের ডাল মড়মড় করে ভাঙা, জল শুষে মুখে ঢালা, ঘাস ছিঁড়ে মাটি ঝেড়ে মুখে পোরা- কী না কাজে লাগে শুঁড়। এমনকি মাটিতে যদি ছোট্ট একটা ফল পড়ে থাকে সেটাও শুঁড়ের ডগা দিয়ে তুলতে অসুবিধা হয় না হাতিদের। হাতির অন্য আর একটা মজার অঙ্গ হলো- হাতির দাঁত । মুখের উপরের পাটির একজোড়া দাঁত বাড়তে বাড়তে লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসে। সেই দাঁত অনায়াসে ছয়-সাত ফুট লম্বা হতে পারে। তবে ভারতীয় মেয়ে হাতিদের দাঁত লম্বা হয় না।

হাতিরা দল বেঁধে থাকে। হাতির দল আসলে একেকটা পরিবার। হাতি এমনিতে খুব শান্ত স্বভাবের প্রাণী কিন্তু বাচ্চার কষ্ট একদম সহ্য করতে পারে না। মানুষের মা ও বাবা তাদের সন্তানকে সবসময় আগলে রাখেন। হাতিরাও তাদের সন্তানকে সবসময় চোখে চোখে রাখে। কখনই বিপদ হতে পারে এমন জায়গায় যায় না। পরিবারের প্রধান হলো মা বা দিদিমা, অন্য সদস্যরা হলো তাদের মেয়ে, নাতি আর নাতনিরা। বিপদে পড়লে কোনো হাতিরা শুঁড় উঁচু করে ডাকতে থাকে দলের হাতিরা তখন একত্র হয়ে বিপদের মোকাবিলা করে। তোমরা হয়তো শুনে থাকবে রেললাইন পেরানোর সময় কোনো হাতি হয়তো ট্রেনের ধাক্কা খেয়ে আহত হলো। দলের অন্য হাতিরা তাকে ঘিরে পাহারা দেয়। হাতিসমাজের নিয়ম খুব কড়া। পথ চলতে চলতে কোনো হাতির বাচ্চা দলছুট হলে হাতির দল তাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করে। কিন্তু যদি দেখে যে হারানো হাতি মানুষের কাছে আশ্রয় পেয়েছে তবে তাকে আর কোনোদিনই গ্রহণ করে না। ছেলে হাতিরা পুরোপুরি বড়ো হয়ে গেলে দল ছেড়ে একা একা ঘুরতে ভালোবাসে। তবে মাঝেমাঝে দলের সঙ্গেও থাকে। বিশাল শরীরের জন্য হাতির খাবারও লাগে অনেক। একেকটা হাতি দিনে দেড়শো কেজি পর্যন্ত ঘাস-গাছ-পাতা খেতে পারে। হাতি জঙ্গলে থাকতেই ভালোবাসে কিন্তু জঙ্গলে খাবার কম পড়ে গেলে হাতিরা খাবারের খোঁজে ফসলের ক্ষেতে গ্রামে ঢুকে পড়ে। সেসময় বাধা দিলে তারা ঘরবাড়ি ভেঙে ফেলে, মানুষকে আঘাত করে। হাতি এত বিশাল, এত শক্তিশালী যে সে আঘাতে মানুষের বেঁচে থাকা মুশকিল। হাতির যাতায়াতের পথে মানুষ ঘরবাড়ি তৈরি করছে, রাস্তা, রেললাইন বসাচ্ছে। তাই হাতির সঙ্গে মানুষের সংঘাত বাড়ছে।

তোমার অঞ্চলে যদি হাতির আনাগোনা থাকে বা জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে তোমার সঙ্গে যদি মাহুতের পরিচয় হয় তবে হাতির আচরণ সংক্রান্ত নীচের তথ্যগুলি জানার চেষ্টা করো।

- হাতির মতো মানুষ যখন কোনো বিপদে পড়ে তখন অন্যদের কাছ থেকে কী ভাবে সাহায্য চায়?
- হাতির মতো তোমার কোনো বন্ধুর বিপদে তুমি কী কী ভাবে সাহায্য করতে পারো?
- হাতি মায়েদের কাছে শিশুরা তাদের সমাজের নানা নিয়মকানুন শেখে। আমরা আমাদের মায়ের কাছ থেকে কী কী শিখি?

শিম্পাঞ্জি

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন- জীবজগতে শিম্পাঞ্জিদের সঙ্গে মানুষের সব থেকে বেশি মিল। অনেক অনেক কাল আগে শিম্পাঞ্জি ও মানুষের পূর্বপুরুষ ছিল একই ধরনের বাঁদর জাতীয় প্রাণী। তারা আর এখন পৃথিবীতে টিকে নেই। টিভিতে বা চিড়িয়াখানায় শিম্পাঞ্জিদের হাবভাব রকমসকম দেখলেই মনে হয় এক্কেবারে আমাদের মতো! এরা পাথর দিয়ে হাতুড়ির মতো আঘাত করে খোলা ভেঙে বাদাম খায়; উইপোকার ঢিবিতে কাঠি ঢুকিয়ে উই শিকার করে। প্রতি রাতে গাছের ডালে পাতার বাসা বানিয়ে ঘুমায়। আমাদের মধ্যে যারা কথা বলতে পারেন না তারা যেমন আকারে ইঙ্গিতে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে পারেন, পোষা শিম্পাঞ্জিদের শেখালে তারাও সেরকম পারে। এরা সহজেই মানুষের বন্ধু হয়।

আফ্রিকার গভীর জঙ্গল ছাড়া শিম্পাঞ্জিদের আর কোথাও প্রাকৃতিক পরিবেশে পাওয়া যায় না। সেখানেও তাদের সংখ্যা খুব কমে গেছে। চোরাশিকারির উপদ্রব আর শিম্পাঞ্জিদের বাসস্থানের জঙ্গল কমে যাওয়ায় শিম্পাঞ্জিদের সংখ্যা খুব কমে আসছে।

শিম্পাঞ্জিরা শাকপাতা-ফলমূলই বেশি খায়। কিন্তু মাঝে মাঝে উইপোকা বা ছোটোখাটো হরিণ শিকার করেও খেয়ে থাকে।

নীচের ছবিগুলোতে শিম্পাঞ্জিদের আচরণগুলো লক্ষ করো।

পরিযায়ী পাখি

যারা শীত পড়লে শীতের দেশ থেকে গরমের দেশে চলে আসে। শীত কাটলে আবার সেখানে ফিরে যায় তাদের বলে পরিযায়ী। অনেক পাখি আছে যারা শীতের সময় তিব্বত, ভুটান, লাদাখ- হিমালয়ের উঁচু পার্বত্য অঞ্চল, যেখানে খুব শীত পড়ে, বরফে ঢেকে যায়, খাবারদাবার মেলা মুশকিল-সেখান থেকে আমাদের সমতলের দেশে নেমে আসে। এখানে ওখানকার তুলনায় অনেক কম শীত আর খাবারদাবারও মেলে প্রচুর। ওখানে যখন শীত কাটে, বরফ গলে যেতে থাকে গাছপালায় পাতা-ফুল-ফল আসে আবার সেসময় ফিরে যায় তারা। এজন্য তাদের হয়তো হাজার কিলোমিটার উড়ে যেতে হয়। এমনও পাখি আছে যারা উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু অঞ্চলে অর্থাৎ পৃথিবীর এক শেষ প্রান্ত থেকে অন্য শেষ প্রান্তে উড়ে যায়। আমাদের এখানে শীতের সময়

আসে নানারকমের পরিযায়ী বুনো হাঁস। কলকাতার কাছে সাঁতরাগাছির ঝিলে, গ্রামবাংলার নানা বিল-জলায় শীতের সময় বুনো হাঁসদের দেখা যায়। লেজ নাচিয়ে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ানো খঞ্জনা, বা মাঠের কোনায় কুল বা অন্য গাছের নীচু ডালে শিকারের সন্ধানে চুপ করে বসে থাকা চোখে-কালো-দাগ খয়েরি রঙের কাজল-পাখি - এরাও কিন্তু পরিযায়ী হিমালয় থেকে আসা শীতের অতিথি। এত লম্বা যাত্রাপথ কোন কোন দিকচিহ্ন অনুসরণ করে এরা পাড়ি দেয় তা এক বিস্ময়ের কথা। আর এত পথ পাড়ি দিতে এত ছোটো দেহে প্রয়োজনীয় শক্তি কোথা থেকে পায় সেটাও বিজ্ঞানীদের কাছে গবেষণার বিষয়।

- তোমার এলাকায় কোন কোন পরিযায়ী পাখি আসে, তাদের দেখতে কেমন, কী খায়, বছরের কোন সময়ে দেখা যায়? .....।
- পশ্চিমবঙ্গের সমতলে হিমালয় থেকে যেসব পরিযায়ী হাঁস আসে তাদের নাম কী কী? এরা কোথা থেকে আসে? .....।
- আর্কটিক টার্ন নামক পরিযায়ী পাখি কোথা থেকে কোথায় যায়?.....।
- কোথাকার পাখি কোথায় যাচ্ছে তা কীভাবে জানা যায়? .....।
- পরিযায়ী পাখিদের এই যাযাবর বৃত্তির কারণ কী? .....।

কাক

কাক মানুষের সবথেকে পরিচিত পাখিদের মধ্যে অন্যতম। সারা পৃথিবীতে চল্লিশটারও বেশি জাতের কাক আছে। আমাদের এখানে অবশ্য আমরা দুটো জাতকে খুব দেখি। পাতিকাক আর দাঁড়কাক। পাতিকাক-এর ডানা, লেজ, গলা, মাথা, ঠোঁট চকচকে কালো, কিন্তু ঘাড় আর পেট ছাই-ছাই ধূসর রং-এর। দাঁড়কাকের পুরো শরীর কুচকুচে কালো, চেহারাতেও পাতিকাকের থেকে বড়োসড়ো। কাক-রা সব কিছু খায়। আবর্জনা ঘেঁটে খাবার খায়। সুযোগ পেলে ইঁদুর, ছোটোপাখি এসবও শিকার করে। আবর্জনা ঘেঁটে খায় বলে আমাদের ঘেন্না লাগে বটে, কিন্তু কাকদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। পুরোনো দিনের গল্পকথায় তাদের বুদ্ধির অনেক কাহিনি আছে। বুদ্ধিতে শিম্পাঞ্জিরা নাকি মানুষের পরেই। এখন বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে বলেছেন কাকরা প্রায় শিম্পাঞ্জিদের মতোই বুদ্ধিমান। কাকেরা খাবার লুকিয়ে রাখতে পারে। আবার মানুষের মতো কাকেদেরও সভা বসে। সেখানে শত শত কাক জড়ো হয়।

তবে বাসা তৈরির বিষয়ে কাকদের সমস্যা আছে। প্রচণ্ড ঝড়ে বাসা ভেঙে প্রায় সময়ই বাচ্চা কাক মাটিতে পড়ে যায়। কাক-রা সামাজিকও। তোমার পাড়ার কাউকে কোনোদিন বিপদে পড়তে দেখেছ? বিপদে পড়লে কোনো মানুষ সাহায্যের জন্য প্রতিবেশীদের ডাকাডাকি করে। কেউ বিপদে পড়লে সব কাকরাও একসঙ্গে কেমন জড়ো হয়ে কা-কা করে ডাকতে থাকে দেখোনি? তখন সবাই ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসে।

- প্রতিদিন কাকদের দেখো। তাদের বুদ্ধি আর সামাজিকতার পরিচয় কী কী পাচ্ছ লিখে রাখো .....।
- একের বিপদে অন্য কাকেরা কীভাবে সাহায্য করে, তা দেখেছ কিনা আলোচনা করো।

মশা

তোমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় - কোন পোকাকে তোমাদের খুব অপছন্দ? তোমরা অনেকেই বলবে - মশা। মানুষকে কামড়ানো মশার স্বভাব। শুধু কামড়ানো? রক্ত চুষে নেবার জন্য কামড়ায়। যে জায়গায় হুল ফোটায় সেখানে ফুলে যায়, জ্বালা করে। তার ওপর, মশাদের শরীরে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি, ফাইলেরিয়া - এরকম মারাত্মক সব রোগের জীবাণু থাকতে পারে, হুল ফোটাবার সময় সেই জীবাণু মানুষের শরীরে ঢুকে যেতে পারে।

কিউলেক্স

ইডিস

পুরুষ মশারা কিন্তু রক্ত খায় না। মেয়ে মশা রক্ত খায়- নইলে তারা ডিম পাড়তে পারে না। এমনিতে পুরুষ আর মেয়ে মশা - দুজনেই গাছের রস খেয়ে বেঁচে থাকে। রক্তপান করে স্ত্রী-মশারা স্রোত নেই এমন জলে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে লার্ভা (শূককীট) বেরোয়। লার্ভারা কিলবিল করে জলের খাবার খেয়ে খেয়ে বড়ো হয়, তারপর পিউপা (মূককীট) হয়ে যায়। পিউপা-রা কিছু খায় না, তারা কিছু দিন বাদেই খোলস ফেলে পুরোপুরি একটা মশা হয়ে জল থেকে বেরিয়ে উড়ে যায়।

অ্যানোফিলিস

নানা জাতের মশা থাকে আমাদের আশেপাশে। তাদের দেখতে যেমন আলাদা, স্বভাব-চরিত্রও নানাধরনের। ম্যালেরিয়ার জীবাণু যাদের শরীরে থাকে তারা হলো - অ্যানোফিলিস, এরা দেয়ালে বসলে মনে হয় সরু একটা কাঁটা যেন খাড়া হয়ে রয়েছে। এরা ওড়বার সময় আওয়াজ করে। এদের ডানায় কালো ছোপ থাকে। মেয়ে অ্যানোফিলিস ও ইডিসরা ছোটো জায়গায় জমা পরিষ্কার জলে ডিম পাড়ে। ইডিসরা হলো খুব ছোটো মশা। এদের পেটে আর পায়ে সাদা-কালো ডোরা থাকে। এরা দিনের বেলায় কামড়ায়। এদের কামড়ের সঙ্গে ডেঙ্গির জীবাণু ঢুকে যেতে পারে। কিউলেক্স নামে আরেক ধরনের মশা আছে। এরা গভীর রাতে কামড়ায়। এদের ডানায় কোনো ছোপ থাকে না। এদের ওড়ার সময় কোনো শব্দ হয় না। তবে সব মশাই রোগজীবাণু বহন করে এমন নয়। তবু সাবধান থাকাই ভালো। মশারি টাঙিয়ে শুলে মশা কামড়াতে পারে না। জমা জল ছাড়া যেহেতু মশা ডিম পাড়তে পারে না, তাই জল কোথাও জমতে দেওয়া উচিত নয়।

টুকরো কথা

তোমরা 4-5 জনের একটা ছোটো দল তৈরি করো । তারপর দেখো তোমার বাড়ির আশেপাশে কোথাও ডাবের খোলা, প্লাস্টিকের কাপ, টব, ফেলে দেওয়া ছোটো বালতি বা মগে পরিষ্কার জল জমে আছে কিনা। থাকলে জমা জল ফেলে দাও। এভাবে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গির মতো রোগ থেকে তোমার অঞ্চলকে মুক্ত রাখতে সাহায্য করতে পারো।

মাছ

মাছ হলো পুরোপুরি জলের প্রাণী। মুখ দিয়ে জল গিলে ফুলকোর মধ্যে জল চালিয়ে কানকো দিয়ে বের করে দেয়। ফুলকোর সাহায্যে জল থেকে অক্সিজেন শুষে নেয় আর কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয়। কাজেই জলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে মাছদের কোনো অসুবিধা নেই। সমুদ্রের নোনাজল, সুন্দরবনের আধানোনতা আধামিঠে যাকে বলে খাঁড়ি জল, নদী-খাল-বিল-পুকুরের মিষ্টি জল, যে-কোনো জলেই হরেক জাতের মাছেরা থাকে। কেউ খায় জলের ছোটো ছোটো পোকামাকড়, শ্যাওলা, কেউ খায় জলার গাছের শাক-পাতা, কেউ বা পেটে পোরে ছোটো ছোটো মাছদের। মাছদের কানকোর পাশে থাকা পাখনা দুটো যেন নৌকার বৈঠা, জল ঠেলে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। লেজের পাখনা যেন নৌকার হাল—মাছ যে দিকে যেতে চায়, মাছকে সেদিকে নিয়ে যায়।

মাছেদের মাবাবারাও তাদের বাচ্চাদের জন্য খুব চিন্তা করে। শোল, গজাল, চিতল জাতীয় মাছেরা বাচ্চার যত্ন নেয় ডিম থেকে বড়ো হওয়া পর্যন্ত। বাবা-মা দুজনেই এই কাজ করে। মা যখন ওই বাসায় ডিম দিতে শুরু করে, বাবা মাছেরা তখন পাহারা দিতে বাইরে সারাক্ষণ বসে থাকে। শত্রুকে দেখলে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনোর পর বাবা-মা-র কাজ আরো বেড়ে যায়। তখন বাচ্চাদের ঘিরে রেখে পাহারা দেয়। তেলাপিয়া জলের নীচে নরম মাটিতে লম্বা করে অনেকগুলো খাঁজ কাটে। তারপর সেখানে বাসা বানায়। আর বাবা তেলাপিয়া ওপর থেকে পাহারা দেয়। মা

তেলাপিয়ার মুখের ভেতরে থাকা থলির মধ্যে শিশুরা জন্ম নেয়। তারপর বেরিয়ে এসে জলে সাঁতার কাটে খাবার সংগ্রহ করে। কখনও ভয় পেলে আবার মায়ের মুখের থলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। এ যেন ক্যাঙারুর পেটে থাকা বাচ্চাদের নিরাপদ থলির মতো।

সাগরের জলে সী হর্স বলে একটা মাছ দেখা যায়। বাবা সী হর্সের লেজের কাছে একটা বিশেষ থলি থাকে। মা সী হর্স ওই থলির মধ্যে ডিম তুলে রাখে। বাবা দিনরাত ওই ডিমগুলোকে পাহারা দেয়। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোনোর পরও বাবা থলির মধ্যে বাচ্চাগুলোকে রেখে বড়ো করে তোলে।

অ্যাকোয়ারিয়ামে অনেক ধরনের রঙিন মাছ থাকে। এদের একটা হলো প্যারাডাইস মাছ। বাবা প্যারাডাইস মুখের লালা বার করে বাতাসে বুদবুদ ছাড়ে। তা দিয়ে মা প্যারাডাইস মাছের ডিম পাড়ার বাসা তৈরি করে। বাবা মাছ ডিমগুলোকে পাহারা দেয়। শিশু মাছদেরও লালন পালন করে। মাছেদের জলে সবসময় বিপদের মধ্যে কাটাতে হয়। কখনও জলে অক্সিজেন কমে গেল। কখনও বা জল দ্রুত শুকিয়ে যেতে শুরু করল। আবার কখনও জলের মধ্যে নানা বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মিশে যায়। মাছরা বিপদে পড়লে গা থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ ছড়ায়। টের পেলে অন্যান্য মাছরা সতর্ক হয়ে যায়। আর বিপদ বুঝে জলের মধ্যে ছোটাছুটি করে।

বিজ্ঞানীরা এখনও পর্যন্ত বত্রিশ হাজারেরও বেশি জাতের মাছের খোঁজ পেয়েছেন। আর কোনো মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে এত বেশি বৈচিত্র্য নেই। মাছ মানুষের প্রিয় খাদ্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মানুষ যে কটা জাতের মাছ খেতে শিখেছে তার সংখ্যা সামান্যই।

তোমরা 4-5 জনের এক একটা ছোটো দল বাজার থেকে জ্যান্ত মাছ সংগ্রহ করে অ্যাকোয়ারিয়াম, চৌবাচ্চা বা কোনো ছোটো জলাধারে রেখে মাছের নানা আচরণ দেখতে পারো।

- একটা পুকুরে কিছু চালের কুঁড়ো, মুড়ি বা অন্য কিছু খাবার দাও। দেখো তো কোন কোন মাছ তা খেতে আসে।
- হঠাৎ শত্রুর মুখোমুখি হলে বিভিন্ন মাছ কী কী আচরণ করতে পারে? মাছেদের এরকম আচরণ কী মানুষের মধ্যে দেখা যায়?
- পুকুরে রুই, কাতলা, পুঁটি, খলসে, শোল এরকম কত মাছ থাকে। তারা কী মিলেমিশে থাকে না ঝগড়া করে? এ বিষয়ে তোমরা আলোচনা করে লিখে ফেলো।
- ডিম ফুটে বেরোনো শিশু শোলদের মা শোলমাছ কীভাবে রক্ষা করে?

সাপ

তোমাদের যদি প্রশ্ন করা হয় - কোন পরিচিত প্রাণীকে তোমরা সবচাইতে ভয় পাও? তোমরা অনেকেই বলবে সাপ। এদের হাত বা পা নেই। কিন্তু এরা মাংসাশী, অন্য প্রাণীকে ধরে। ইঁদুর থেকে হরিণ সব প্রাণীকেই এরা গিলে খায়। ইঁদুর, ছুঁচোর মতো ফসলখেকো প্রাণীদের খেয়ে এরা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। ভয় পেয়ে সাপ মেরে ফেললে আমাদের ক্ষতি হয়। খুব বরফের দেশ ছাড়া প্রায় সর্বত্রই এদের দেখা মেলে। গাছের ডাল, মাটির তলা, কিংবা জলে বহু সাপেরই বাসস্থান। সাপের মাথার হাড় এমনভাবে সাজানো যে সাপ চোয়াল দুটোকে দু-পাশে ছড়িয়ে বিশাল হাঁ করতে পারে। তাই সাপ নিজের মুখের থেকেও বড়ো ইঁদুর বা পাখি শিকার করে গিলতে পারে। সাপের চামড়া আঁশ দিয়ে ঢাকা। ডাঙায় সাপ পেটের আঁশের সাহায্যে চলাফেরা করে। সাপ সারাজীবন নিয়মিতভাবে পুরোনো আঁশের খোলস পালটায়। সাপদের কান নেই, কিন্তু এদের ঘ্রাণশক্তি খুব ভালো। এরা চেরা জিভ দিয়ে বাতাসে ভাসা গন্ধের অণু মুখের ভিতর নিয়ে গন্ধ টের পায়। এরা বুক দিয়ে মাটিতে হওয়া সামান্য কম্পনও টের পায়। কিছু সাপের মুখের ওপর তাপ মাপার যন্ত্র আছে। বেশিরভাগ সাপই ডিম পাড়ে। তবে চন্দ্রবোড়া, মেটুলির মতো কোনো কোনো সাপ সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে। বেশিরভাগ সাপই মানুষের জন্য বিষাক্ত নয়। মানুষের জন্য ভয়ংকর বিষাক্ত খুব কম প্রজাতির সাপই, যেমন- কালাচ বা ডোমনাচিতি, চন্দ্রবোড়া, কেউটে, গোখরো, শঙ্খচূড়, শাঁখামুটি। বিষাক্ত সাপরা বিষকে শিকার মারতে ও হজম করতে কাজে লাগায়। সবার বিষদাঁত একই মাপের হয় না। কোনো বিষ শিকারের স্নায়ুতন্ত্রে আঘাত করে আবার কোনোটা রক্তসংবহনতন্ত্রে। সাপ মানুষের সামনে পড়ে নিজেকে বিপদগ্রস্ত মনে করলে প্রথমে ভয় দেখিয়ে সতর্ক করে। যেমন কেউ জোরে নিশ্বাস ছাড়ে, হিসহিস শব্দ করে বা কেউ বা ফণা তোলে বা লেজের প্রান্ত

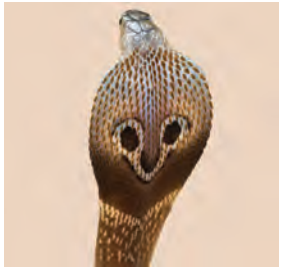

নাড়ায়। তারপর নিজের বাঁচার রাস্তা না পেলে কামড়ায়। কিন্তু, সাপ খাদ্য ধরা ছাড়া বিষকে নষ্ট করতে চায় না। মানুষরা কিন্তু কোনো সাপের খাদ্য নয়।

বাঘ

বনে বেড়াতে যাওয়ার কথা উঠলে তোমাদের কোন প্রাণীকে সামনাসামনি দেখার সবথেকে ইচ্ছা জাগে? তোমাদের অনেকেই বলবে বাঘ। বনের রাজা নিজের থেকেও বড়ো প্রাণীদের অনায়াসে শিকার করে। এদের সাংঘাতিক জোরালো চোয়াল আর তাতে ধারালো বড়ো ক্যানাইন বা শ্বদন্ত দাঁত থাকে। বিড়ালের মতোই এদের চলাফেরার সময় সামান্য শব্দও হয় না। থাবার ধারালো নখ শিকারের আগে পর্যন্ত ভেতরে ঢোকানো থাকে। বাঘের সামনের পা খুব নমনীয়। ফলে ভিতরের দিকে পা ভাঁজ করতে পারে। এদের দর্শন ও শ্রবণশক্তি খুব প্রখর। যে-কোনো জন্তু বা মানুষের সামান্যতম চলাফেরাতেও এরা সজাগ হয়ে পড়ে। দিনের বেলায় মানুষ আর বাঘের দৃষ্টিশক্তি প্রায় সমান । কিন্তু রাতের বেলা? বাঘের চোখের রেটিনায় ট্যাপেটাম লুসিডাম বলে একটা বস্তু থাকে, তাই বাঘরা অল্প

আলোতেও মানুষের থেকে ছয়গুণ ভালো দেখতে পায়। বাঘেরা বাতাসে গন্ধ শুঁকে শিকারের পিছনে ধাওয়া করে না। কিন্তু একেকটা বাঘ নিজের এলাকা চিহ্নিত করতে মূত্রনালী থেকে এক ধরনের তরল মাটিতে ও গাছে ছিটিয়ে দেয়। আবার গাছের কাণ্ডে আঁচড় কেটেও নিজের অঞ্চলের সীমানা ঠিক করে। গন্ধ শুঁকেই বাঘ বাঘিনি পরস্পরকে খুঁজে নেয়। গৃহপালিত বিড়াল তার মলকে মাটিতে চাপা দেয়, বাঘ কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট স্থানে তার মলত্যাগ করে নিজের অস্তিত্ব জানান দেয়। প্রাপ্তবয়স্ক বাঘ সাধারণত একা থাকে। একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল নিয়ে থাকে। অন্য বাঘের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কখনো-কখনো অন্য বাঘ ঢুকে পড়লে দুজনের জোর লড়াই হতে পারে।

হরিণ আর শুয়োরের মাংস এদের খুব প্রিয় খাদ্য। সুন্দরবনের বাঘ, কাঁকড়া, মাছ, গোসাপ পর্যন্ত খায়। সুন্দরবনের বাঘের গায়ের চামড়া হালকা হলুদ থেকে লালচে হলুদ রং-এর হয়। আর এর গায়ে ডোরাকাটা কালো দাগ থাকে আঙুলের ছাপের মতো। ত্বকের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য এদের বাদাবনের হেঁতাল গাছে লুকিয়ে থাকতে সুবিধা হয়। সাধারণত সূর্যাস্ত থেকে গোধূলির মধ্যেকার সময়ে বাঘ শিকার করে। বাঘ তার শিকারকে চিহ্নিত করে, কাছাকছি যতটা যাওয়া সম্ভব যেতে চেষ্টা করে। তারপর তাকে তাড়া করে বা পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁধ বা গলা কামড়ে ধরে। শিকার মারা গেলে নিরাপদ স্থানে টেনে নিয়ে যায় এবং খায়। শিকার বড়ো হলে কয়েকদিন ধরে খায়। শিকারের সব চেষ্টা যে সফল হয় তা নয়। তাই সবদিন খাওয়া জোটে না।

বাঘ একই সঙ্গে হিংস্র ও বুদ্ধিমান। পেটে খিদে থাকুক বা না থাকুক শিকার পেলে কখনোই তারা হাতছাড়া করতে চায় না। নিঃশব্দে শিকারের পিছু নেয়। উদবৃত্ত খাবার গর্ত করে নিজেদের আস্তানার ঝোপের ধারে জমিয়ে রাখে। বাঘ শুধুমাত্র নিঃশব্দে

লাফিয়ে শিকার ধরতে পারে তা নয়, প্রয়োজনে গাছে চড়তে, জলে সাঁতার দিয়ে শিকার করে।

বাঘ ও বাঘিনি দুজনেই হিংস্র। কিন্তু সন্তান পালনের ব্যাপারে বাঘিনির স্নেহ-শাসন লক্ষ করার মতো। বাচ্চা দেওয়ার আগে ভালোভাবে পরিষ্কার করা জায়গা তৈরি করে। বাচ্চা দেওয়ার পর তাদের কাছে সমস্ত দিন ঠায় বসে থাকে। অনেক সময় পাহারা দিতে গিয়ে নিজের খাওয়া পর্যন্ত হয় না। কিন্তু ওর বাসা যদি কেউ চিনে ফেলে তবে বাঘিনি সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাসা খুঁজে চলে যায়। বাসা বদলের সময় যদি কোনো প্রাণী বা মানুষ তার মুখোমুখি হয় তবে, তার মৃত্যু নিশ্চিত। মধু সংগ্রহ বা কাঠ কাটতে গিয়ে যে সকল মানুষ মারা যান তাদের অধিকাংশের পিছনে থাকে বাঘিনির এই বাসা বদলের ঘটনা।

বাচ্চারা একটু বড়ো হলে বাঘিনি তাদের শিকার শেখাতে নিয়ে যায়। প্রথম প্রথম শিকার করা প্রাণীর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে দেয়। দাঁত বসিয়ে কীভাবে মাংস ছিঁড়ে খেতে হয় তাও শেখায়। তারপর একসময় একটা আধমরা প্রাণীকে বাচ্চাদের কাছে নিয়ে এসে তার থেকে দাঁত দিয়ে মাংস ছিঁড়তে শেখায়। বাচ্চাদের সাঁতার কাটতেও শেখায় বাঘিনিরা। মা বাঘের কাছ থেকে এভাবে ছয়-সাত মাস শিক্ষা পেয়ে শিশু পূর্ণাঙ্গ বাঘে পরিণত হয়। বয়স হলে বা আহত হলে বাঘ মনুষ্য বসতি এলাকায় সহজ শিকারের জন্য চলে আসতে পারে। সুন্দরবন অঞ্চলের অনেক জঙ্গল ঘেঁষা গ্রামে এটা একটা বড়ো সমস্যা। যে বনে বাঘ থাকে, সেখানে মানুষ ঢুকতে ভয় পায়। মানুষের হাত থেকে জঙ্গল রক্ষা করার জন্য বনে বাঘের সংখ্যা বাড়ানো খুব জরুরি। জঙ্গল ধ্বংস হওয়া ও চোরা শিকারের জন্য বাঘের সংখ্যা খুব কমে গেছে। বাঘের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ভারতের বিভিন্ন জঙ্গলকে ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

বাঘের ছবিগুলিতে কী কী আচরণ দেখা যাচ্ছে তা নীচে লেখো।

1. .....। 2. .....। 3. .....।

তিমি

তিমি সামুদ্রিক প্রাণী। অনেকে বলে মাছ। আসলে তিমি স্তন্যপায়ী প্রাণী। তিমির গায়ে কেবল মাথার সামনে নাকের জায়গায় অংশে কিছু লোম থাকে। এদের চামড়ার নীচে চর্বির একটা পুরু স্তর থাকে - যার নাম ব্লাবার (Blubber)। এই চর্বির স্তর দু-ভাবে তিমিদের সাহায্য করে — প্রয়োজনে চলাফেরার শক্তি জোগান দেওয়া আর দেহের তাপ বজায় রাখা। তিমিদের পূর্বপুরুষদেরও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতোই দুটো হাত আর পা ছিল। জলের জীবনে মানিয়ে নেওয়ার জন্য ওদের হাতদুটো পরিণত হয়েছে সাঁতার কাটার অঙ্গ ফ্লিপারে। আর পিছনের পা-দুটো লোপ পেয়েছে। জলে বাস করলেও তিমির কিন্তু মাছের মতো ফুলকা থাকে না, থাকে ফুসফুস। কেবল জলের উপরে ভেসে উঠলে তবেই তিমি শ্বাস নেয়। তিমিদের একইসঙ্গে অনেকটা বাতাস নিতে আর ছাড়তে হয়। জলে ডুব দিয়ে ভেসে উঠে তিমি খুব জোরে নিশ্বাস ছাড়ে তার মাথার

উপরে থাকা ব্লোহোল (Blowhole) বা নাকের ফুটো দিয়ে। এত জোরে তারা এই বাতাস ছাড়ে যে ওই নিশ্বাসবায়ু প্রায় 10,20, বা 40 ফুট সোজা ওপরে উঠে যায়। এই নিশ্বাস বায়ু সাধারণত আশপাশের বাতাসের চেয়ে গরম হয়। তাই বাতাসে থাকা জলকণাগুলো বাষ্পে পরিণত হয়। আর তিমি জলে ভেসে উঠলেই অনেক দূর থেকে এই সাদা স্তম্ভের মতো দেখা যায়, ঠিক যেন একটা ফোয়ারা। আমরা তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও শ্বাস-প্রশ্বাস চালাই। কিন্তু জলের মধ্যে তিমির সে সুবিধে নেই। তাই তিমিরা কখনোই পুরোপুরি ঘুমোয় না। তিমিরা যখন বিশ্রাম নেয়, তখন তাদের মস্তিষ্কের একটা অংশ জেগে থাকে অন্য অংশটা ঘুমোয়।

তিমি অনেক প্রজাতির হয়। নীল তিমি (Blue whale) কেবল পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো তিমিই নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো প্রাণী। একটা উদাহরণ দিলে তোমরা বুঝতে পারবে। একটা নীল তিমির ওজন তিরিশটা হাতির ওজন বা 2000 মানুষের ওজনের প্রায় সমান। জন্মের সময় এরা লম্বায় 7 মিটার হয় আর ওজনে আড়াই হাজার কেজি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা পূর্ণবয়স্ক নীল তিমি প্রায় 30 মিটার লম্বা আর ওজনে প্রায় দেড় লক্ষ কেজি হয়। দিনে এরা প্রায় তিন থেকে চার হাজার কেজি ছোটো চিংড়ি জাতীয় প্রাণী ক্রিল খায়।

তিমিরা শব্দের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখে। যেমন হাম্পব্যাক তিমি সুরেলা গানের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখে। আর নীল তিমির আওয়াজ একটা জেট ইঞ্জিনের আওয়াজের চেয়েও জোরালো।

নীচের তিমিগুলোকে চিনে রাখো।

হাম্পব্যাক তিমি

স্পার্ম তিমি

নীল তিমি

12 বর্জ্য পদার্থ

বর্জ্য পদার্থের উৎস ও প্রকৃতি

বাড়ির নানা আবর্জনা ও তার ব্যবহার

বাড়ির দক্ষিণদিকের আমগাছের নীচে রফিক বেশ কিছু জিনিসপত্র পড়ে থাকতে দেখল। কাছে গিয়ে হাত দিতে যাবে এমন সময় মা বলে উঠলেন— হাত দিও না বাবা।

রফিক মাকে জিজ্ঞাসা করল— ওগুলো কী গো ?

মা বললেন— ওগুলো আমাদের বাড়ির নানা ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র। পুরোনো জিনিস কেনে এমন ফেরিওয়ালা এলে বলিস তো। ওগুলো বেচে দেবো।

রফিক দেখল এক জায়গায় কিছু পুরোনো শিশিবোতল। আর এক জায়গায় বেশ কিছু প্লাস্টিক প্যাকেট। এক জায়গায় একটা পুরোনো মাটির হাঁড়ির মধ্যে ভাতের ফ্যান ও সবজির খোসা। পাশে একটি ভাঙা রেডিয়ো রয়েছে। ওর না চেনা অনেক জিনিসও রয়েছে।

এবার তোমরা রফিকের মতো তোমাদের বাড়ির কাজে না লাগা জিনিসগুলোর তালিকা তৈরি করো।

বাড়ির কাজে না লাগা জিনিস	রান্নাঘরের কাজে না লাগা জিনিস
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.

এবারে এসো দেখি বর্জ্যকে পদার্থ কেন বলা হয়। নীচের বাক্যগুলো থেকে সঠিক উত্তর বেছে নাও।

বৈশিষ্ট্য
1. বেশ কিছুটা জায়গা দখল করে থাকে/দখল করে থাকে না।
2. নির্দিষ্ট ওজন আছে / ওজন নেই।

এবার তোমরা তোমাদের চারপাশের নানারকম আবর্জনার তালিকা তৈরি করো। তারপর নীচের তালিকাটি পূরণ করো।

আবর্জনার তালিকা	জায়গা দখল করে থাকে কিনা	নির্দিষ্ট ওজন আছে কিনা
1. পচা ফল		
2. বোতাম		
3. থার্মোকলের টুকরো		
4. পুরোনো ব্লেড		
5. মাছের আঁশ		
6. বাতিল ব্যাটারি		
7.		
8.		

এবারে লেখার চেষ্টা করো তোমাদের চেনা বর্জ্য পদার্থগুলোর মধ্যে কোনগুলো কঠিন আর কোনগুলো কঠিন নয়।

বর্জ্য পদার্থের নাম	কী ধরনের বর্জ্য পদার্থ (কঠিন/কঠিন নয়)

কলার খোসা, পটলের খোসা, প্লাস্টিকের বোতল, কাচের টুকরো, টিনের তৈরি ক্যান, কম্পিউটারের ক্যাবিনেট, চটের তৈরি ব্যাগ আর খবরের কাগজের তৈরি ঠোঙা যদি দীর্ঘদিন মাটিতে ফেলে রাখা যায় তবে বেশ কিছু দিন পর দেখা যায় কলার খোসা, চটের ব্যাগ, আর কাগজের ঠোঙা মাটিতে মিশে গেছে। বাকিগুলোর বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি।

এবার তোমার চারদিকে ফেলে দেওয়া বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে কোনগুলো সহজে মাটিতে মিশে যায় আর কোনগুলো দীর্ঘদিন মাটিতে থাকলেও সহজে ভাঙে না, পরিবর্তিত হয় না বা মাটিতে মেশে না, তার একটা তালিকা তৈরি করো।

চারিদিকে ফেলে দেওয়া জিনিসের নাম	কিছুদিন রেখে দিলে যা সহজে মাটিতে মিশে যায়	দীর্ঘদিন রেখে দিলেও যা সহজে মাটিতে মেশে না

চারিদিকে ফেলে দেওয়া জিনিসের মধ্যে যেগুলো খুব তাড়াতাড়ি মাটিতে মিশে যায় তারা হলো **জৈব ভঙ্গুর (Biodegradable) বর্জ্য পদার্থ**। আর দীর্ঘদিন মাটিতে থাকার পরেও যেগুলোর কোনো রকম পরিবর্তন হয় না তারা হলো **জৈব অভঙ্গুর (Non-biodegradable) বর্জ্য পদার্থ**।

পাশে দুটো বালতি রাখা আছে। তোমরা রং করে আলাদা করো। একটা বালতি জৈব ভঙ্গুর আর অন্যটা জৈব অভঙ্গুর বর্জ্য পদার্থের জন্য নির্দিষ্ট।

নীচের বিভিন্ন বর্জ্যকে কোন কোন বালতিতে রাখবে তা নির্দিষ্ট করো।

দু-বছর হলো রতনদের গ্রামে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পিছনদিকটায় ওদের খেলার মাঠ। খেলার বলটা মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পিছনের পাঁচিলের ভেতরে গিয়ে পড়ে। তখন বল কে আনবে তাই নিয়ে চলে লড়াই। আসলে ওখানটা খুব নোংরা। ওদের ধারণা ওখানে গেলে শরীরে রোগ হবে।

বর্জ্য পদার্থের শ্রেণিবিভাগ

বর্জ্য সাধারণত কোথা থেকে পাওয়া যায় এসো জানা যাক।

1. বাড়ি থেকে— যেমন খালি বোতল
2. পুরসভা/পঞ্চায়েতের ডাস্টবিন থেকে—যেমন ভাঙা লাইট
3. কারখানা থেকে তৈরি বর্জ্য— নানারকম রাসায়নিক পদার্থ, তেল
4. ব্যাবসা থেকে তৈরি বর্জ্য— প্যাকেট, কাঠের গুঁড়ো,

5. স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে পাওয়া বর্জ্য—ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, তুলো, গ্লাভস, প্লাস্টার
6. বাড়ি তৈরি করার সময় উদ্ভূত বর্জ্য— পাইপের টুকরো, প্লাস্টিক, অ্যাসবেস্টস
7. চাষের জমি থেকে পাওয়া বর্জ্য— ডিডিটি
8. বাজার থেকে পাওয়া বর্জ্য— পচা সবজি

আগের তালিকা থেকে পাওয়া বর্জ্যগুলির মধ্যে কোনগুলো জৈব ভঙ্গুর/ জৈব অভঙ্গুর এবং কোনগুলো আমাদের কাজে লাগে/লাগে না তার তালিকা তৈরি করো।

তালিকাথেকে প্রাপ্ত বর্জ্যের নাম	জৈব ভঙ্গুর	জৈব অভঙ্গুর	কাজে লাগে/লাগে না

এসো আমাদের বাড়ির ও চারপাশের নানাধরনের বর্জ্যপদার্থ নিয়ে আলোচনা করা যাক। নীচে তোমাদের বাড়ির নানাধরনের আবর্জনার কয়েকটির নাম দেওয়া আছে। তোমরা এইরকম আরো কিছু আবর্জনার নাম নীচের তালিকায় যোগ করো।

বাড়ির নানা ধরনের আবর্জনা

পুরোনো কাগজ	খড়, ভাঙা ডালপালা, ...	প্লাস্টিক প্যাকেট, বিস্কুটের প্যাকেট, ...	তরিতরকারির খোসা, ফলের খোসা, ...	বাজারের প্লাস্টিক ব্যাগ চটের ব্যাগ, ...

বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার

তোমরা এর আগে দুটো বালতিতে বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থকে আলাদা আলাদা করে রেখেছিলে। আচ্ছা ওই নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থের মধ্যে থেকে কোন কোন জিনিসকে আবার কাজে লাগানো যেতে পারে তার তালিকা তৈরি করো।

ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র	কী কাজে লাগানো যেতে পারে
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.

রফিক একদিন ওই ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র থেকে একটা প্লাস্টিকের বোতল খুঁজে বার করল। আর বেশ কিছু কালি শেষ হয়ে যাওয়া রিফিল নিল। তারপর অবসর সময়ে সুন্দর একটা পেনদানি তৈরি করল। পেনদানিটা স্কুলে নিয়ে যেতে স্যার খুব প্রশংসা করলেন।

সুনীতা নতুন জামার ভেতরের কাগজের বোর্ডটা ফেলে না। সেগুলো জমিয়ে ছোট্ট কুঁড়েঘর তৈরি করল। রফিকের মা সবজির খোসাগুলোকে গোরুকে খাইয়ে দিলেন। রফিক পারতপক্ষে দোকান থেকে প্লাস্টিকের ব্যাগ নেয় না। আর নিলেও সেটা বারবার ব্যবহার করে।

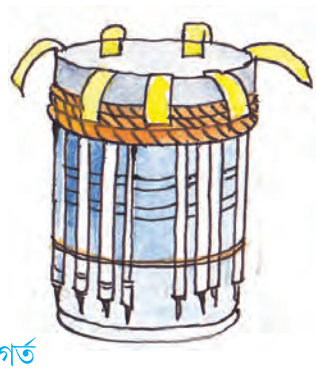

তোমাদের বাড়ির বর্জ্য পদার্থগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করো তা লেখো।

1.	3.
2.	4.

নমিতার বাবা বাগানের পাতা, ফলের / সবজির খোসা ফেলেন না। বাগানের এক জায়গায় গর্ত করলেন। তারপর গর্তে ওই বর্জ্যগুলোকে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে দিলেন, বেশ কিছু দিন পরে বেশ খানিকটা সার তৈরি হলো।

বেশ জোরে মাইকের শব্দ শুনে সুমন্ত্র ছুটে রফিকের বাড়ির বাইরে এল। দেখল একটা রিকসায় বসে একজন লোক জোরে জোরে কিছু একটা বলতে বলতে আসছে। একটু পরে রিকসাটা কাছে এল। সে শুনতে পেল কথাটা। বলছে— 'বাড়ির প্লাস্টিক যেখানে সেখানে ফেলবেন না। নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলুন। পুরসভার গাড়ি এসে ওগুলো নিয়ে যাবে।'

পরদিন সুমন্ত্র ক্লাসে এসে সেকথা বলল। রাবেয়াও বলল আমাদের পাড়াতেও গাড়িটা এসেছিল। রফিক বলল—আমার মা তো কবে থেকেই প্লাস্টিকগুলোকে আলাদা রাখে।

আমাদের চারপাশে পড়ে থাকা নানাধরণের বর্জ্যকে আবার ব্যবহার করতে হবে। আর তার জন্য চাই সুপরিকল্পনা। এব্যাপারে **4R(Reduce, Refuse, Reuse, Recycle)** পদ্ধতির সাহায্য আমরা নিতে পারি।

কমিয়ে আনা (Reduce) : যেসব বর্জ্য পরিবেশে জঞ্জাল বাড়ায়, সেগুলির ব্যবহার কমিয়ে আনতে পারি।

যেমন প্লাস্টিক ব্যাগ, ..., ..., ..., ...,

আবার কাজে লাগানো (Reuse) : ব্যবহার করা বর্জ্য ফেলে না দিয়ে আবার কাজে লাগানো।

যেমন তরকারির খোসা, ..., ..., ..., ...

পুনর্ব্যবহার (Recycle) : ফেলে দেওয়া জিনিস থেকে নতুন কাজের জিনিস তৈরি করা।

পুরোনো লোহা গলিয়ে ধাতুর নতুন কিছু জিনিস তৈরি করা।

....., ..., ..., ...

প্রত্যাখ্যান করা (Refuse) : সুস্থ পরিবেশের জন্য আমরা কিছু জিনিস কিছুতেই ব্যবহার করব না।

যেমন প্লাসটিক ব্যাগ, ..., ..., ..., ...

পরিবেশ ও বিজ্ঞান

পাঠ্যসূচি

1. পরিবেশ ও জীবজগতের পারস্পরিক নির্ভরতা

ক) উদ্ভিদের ওপর প্রাণীর নির্ভরশীলতা
খ) প্রাণীর ওপর উদ্ভিদের নির্ভরশীলতা
গ) এক জীবের ওপর অন্য জীবের নির্ভরশীলতা
ঘ) প্রাণীদের ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা
ঙ) জীবাণুর ওপর মানুষের নির্ভরশীলতা

2. আমাদের চারপাশের ঘটনাসমূহ

ক) একমুখী, বহুমুখী ঘটনা
খ) পর্যাবৃত্ত, অপর্যাবৃত্ত ঘটনা
গ) অভিপ্রেত ও অনভিপ্রেত ঘটনা
ঘ) প্রাকৃতিক ঘটনা, মনুষ্যসৃষ্ট ঘটনা
ঙ) মন্থর ও দ্রুত ঘটনা
চ) ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য
ছ) পরিবর্তন ও শক্তি
জ) ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের আরও ঘটনা

3. মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ

ক) ধাতু ও অধাতু
খ) বিশুদ্ধ ও মিশ্র পদার্থ
গ) মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ
ঘ) চিহ্ন, সংকেত ও যোজ্যতা
ঙ) বিভিন্ন ধরনের মিশ্রণ
চ) মিশ্রণ পৃথককরণের পদ্ধতি

4. শিলা ও খনিজ পদার্থ

ক) নানান ধরনের শিলা
খ) খনিজ পদার্থ ও আকরিক
গ) সংকর ধাতু
ঘ) জীবাশ্ম বা ফসিল
ঙ) জীবাশ্ম জ্বালানি বা ফসিল ফুয়েল

5. মাপজোক ও পরিমাপ

ক) দৈনন্দিন জীবনে পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা ও পরিমাপের এককসমূহ
খ) দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল, আয়তন, ভর ও সময়
গ) উদ্ভিদ ও প্রাণীর বৃদ্ধির পরিমাপ

6. বল ও শক্তির ধারণা

ক) স্থিতি, গতি ও শক্তির ধারণা
খ) স্পর্শহীন বল
গ) শক্তির ধারণা, প্রকারভেদ, রূপান্তর, উৎস, শক্তি শৃঙ্খলের ধারণা ও শক্তি সমস্যা
ঘ) প্রাত্যহিক জীবনে ঘর্ষণ বল

7. তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের স্থিতি ও গতি

ক) চাপের ধারণা
খ) চাপের প্রভাব
গ) বারনৌলির নীতির ধারণা

8. মানুষের শরীর

ক) হৃৎপিণ্ড
খ) রক্ত
গ) ফুসফুস
ঘ) অস্থি, অস্থিসন্ধি ও পেশি
ঙ) শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশ

9. সাধারণ যন্ত্রসমূহ

ক) যন্ত্রের ধারণা
খ) লিভার
গ) নততল
ঘ) স্ক্রু, পুলি, চক্র ও অক্ষদণ্ড
ঙ) যন্ত্রের পরীক্ষা

10. জীববৈচিত্র্য ও তার শ্রেণিবিভাগ

ক) প্রজাতি সম্পর্কে ধারণা
খ) জীবরাজ্যের শ্রেণিবিভাগ

11. কতকগুলি প্রাণীর বাসস্থান ও আচার আচরণ

ক) আচরণ বিজ্ঞান আর আচরণ বিজ্ঞানী
খ) কতকগুলি বিশেষ প্রাণীর আচার-আচরণ

12. বর্জ্য পদার্থ

ক) বর্জ্য পদার্থের উৎস ও প্রকৃতি
খ) বর্জ্য পদার্থের শ্রেণিবিভাগ
গ) বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার

তিনটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচি

প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : (প্রত্যেক বিষয় থেকে 5 নম্বর নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে)

1. পরিবেশ ও জীবজগতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (1-20)
2. আমাদের চারপাশের ঘটনাসমূহ (21-38)
3. মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ (39-54)

দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (প্রত্যেক বিষয় থেকে 5 নম্বর নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে)

4. শিলা ও খনিজ পদার্থ (55-62)
5. মাপজোক বা পরিমাপ (63-78)
6. বল ও শক্তির প্রাথমিক ধারণা (79-99)
7. তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের স্থিতি ও গতি (100-105)
8. মানুষের শরীর (106-132)

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (প্রত্যেক বিষয় থেকে 10 নম্বর নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে)

9. সাধারণ যন্ত্রসমূহ (133-140)
10. জীববৈচিত্র্য ও তার শ্রেণিবিভাগ (141-155)
11. কতকগুলি বিশেষ প্রাণীর বাসস্থান ও আচার-আচরণ (156-174)
12. বর্জ্য পদার্থ (175-180)

বিশেষ মন্তব্য : তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দেশিত অংশগুলির সঙ্গে প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের অন্তর্গত অধ্যায় মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ, দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের অন্তর্গত মাপজোক বা পরিমাপ, বল ও শক্তির ধারণা অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত হবে। সংযোজিত অংশটি ধরে পাঠ্য প্রতিটি বিষয় অবলম্বনে 10 নম্বরের প্রশ্নপত্র মূল্যায়নের জন্য তৈরি করতে হবে। সেক্ষেত্রে অধ্যায় ও তা থেকে তৈরি করা প্রশ্নের মূল্যায়নের সারণিটি হবে নিম্নরূপ :

অধ্যায়	প্রশ্নের মূল্যমান
1. সাধারণ যন্ত্রসমূহ	10
2. জীববৈচিত্র্য ও তার শ্রেণিবিভাগ	10
3. কতকগুলি বিশেষ প্রাণীর বাসস্থান ও আচার-আচরণ	10
4. বর্জ্য পদার্থ	10
5. মৌলিক, যৌগিক ও মিশ্র পদার্থ	10
6. মাপজোক বা পরিমাপ	10
7. বল ও শক্তি	10

প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য সক্রিয়তামূলক কার্যাবলী	প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে ব্যবহৃত সূচকসমূহ
i) সারণি পূরণ	1) অংশগ্রহণ
ii) ছবি বিশ্লেষণ	2) প্রশ্ন ও অনুসন্ধান
iii) তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ	3) ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য
iv) দলগত কাজ ও আলোচনা	4) সমানুভূতি ও সহযোগিতা
v) কর্মপত্র পূরণ ও সমীক্ষার বিবরণ	5) নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ
vi) সঙ্গী মূল্যায়ন ও স্ব-মূল্যায়ন	
vii) হাতের কাজ ও মডেল প্রস্তুতি	
viii) ক্ষেত্র সমীক্ষা (Field work)	

প্রশ্নের নমুনা

(এই ধরনের নমুনা অনুসরণ করে পার্বিক মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র তৈরি করা যেতে পারে। প্রয়োজনে অন্যান্য ধরনের প্রশ্নও ব্যবহার করা যেতে পারে। কী কী ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে তার কিছু নমুনা দেওয়া হলো।)

1. ঠিক উত্তর নির্বাচন করো : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 1 নম্বর)

i) কোন রাশিটি মৌলিক রাশি নয়?— (a) আয়তন (b) দৈর্ঘ্য (c) সময় (d) ভর

ii) 'বেগ' রাশিটির SI একক হলো — (a) cm/s^2 (b) m/s^2 (c) cm/s (c) m/s

iii) 9˙8 m-কে কিলোমিটারে প্রকাশ করলে হয়—(a) 0˙098 km (b) 0˙0098 km (c) 0˙980 km (d) 0˙00098 km

iv) কোনো বস্তুর উপরিতলের পরিমাপ যে রাশি দিয়ে প্রকাশ করা হয় তা হলো — (a) আয়তন (b) উচ্চতা (c) ক্ষেত্রফল (d) ঘনত্ব

v) একটা ছোটো অসম আকৃতির পাথরের টুকরোর আয়তন পরিমাপ করতে তুমি নীচের দেওয়া কোন কোনগুলো ব্যবহার করবে— (a) স্কেল, কাগজ, পেনসিল (b) তুলাযন্ত্র, স্কেল, পেনসিল (c) আয়তনমাপী চোঙ, তুলাযন্ত্র, পেনসিল (d) জল, আয়তনমাপী চোঙ, নাইলনের সুতো

vi) ইলেট্রিক হর্ন বাজানো হলো— ঘটনাটিতে— (a) যান্ত্রিকশক্তি শব্দশক্তিতে রূপান্তর হয়েছে (b) তাপশক্তি শব্দশক্তিতে রূপান্তর হয়েছে (c) বৈদ্যুতিক শক্তি শব্দশক্তিতে রূপান্তর হয়েছে (d) রাসায়নিক শক্তি শব্দশক্তিতে রূপান্তর হয়েছে

vii) নীচের কোন খাদ্যশৃঙ্খলটি সঠিক নয়— (a) ঘাস ⟶ গঙ্গাফড়িং ⟶ ব্যাং ⟶ সাপ ⟶ বেজি (b) গাছের পাতা ⟶ পঙ্গপাল ⟶ শালিক পাখি (c) গাছের পাতা ⟶ খরগোশ ⟶ বাজ ⟶ পাখি (d) ঘাস ⟶ হরিণ ⟶ সাপ

viii) একটা ফুটবলকে মাঠের ওপর গড়িয়ে দিলে তা কিছু দূর গিয়ে থেমে যায়। ঘটনাটির জন্য দায়ী— (a) বলটির উপরিতলের ক্ষেত্রফল (b) বলটির আকৃতি (c) ঘর্ষণ বল (d) বলটির গতি

ix) চাপ $= \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$ সূত্রটি থেকে পেরেকের ক্ষেত্রে চাপ বাড়াবার কোন নীতিটি কাজে লাগানো হয়েছে— (a) ক্ষেত্রফল বাড়ানো হয়েছে (b) ক্ষেত্রফল ও বল দুটিকেই বাড়ানো হয়েছে (c) ক্ষেত্রফল কমানো হয়েছে (d) বলকে কমানো হয়েছে

x)

বাধা আলম্ব 1-ম শ্রেণির লিভার

লিভারটির কর্মদক্ষতা বাড়াতে হলে— (a) B বিন্দু A বিন্দুর কাছাকাছি হতে হবে, (b) A বিন্দু B বিন্দুর কাছাকাছি হতে হবে, (c) B বিন্দু C বিন্দুর কাছাকাছি হতে হবে, (d) B বিন্দু C ও A-বিন্দুর মধ্যখানে থাকতে হবে,

xi) কোন ঘটনাটি একমুখী— (a) মোম গলে যাওয়া (b) গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাওয়া (c) রোদের তাপে রেললাইন গরম হয়ে যাওয়া (d) জল থেকে বাষ্প তৈরি হওয়া

xii) কোনটি পর্যাবৃত্ত ঘটনা নয়— (a) ঋতু পরিবর্তন (b) জোয়ার-ভাটা (b) হঠাৎ বন্যা হওয়া (d) পূর্ণিমা

xiii) কোনটি অন্য শব্দগুলির থেকে আলাদা— (a) বক্সাইট (b) হেমাটাইট (c) তামা (d) কপার গ্লান্স

xiv) কোনটি অন্য শব্দগুলির থেকে আলাদা— (a) গ্রানাইট (b) পিউমিস (c) ব্যাসাল্ট (d) চুনাপাথর

xv) কোনটি মৌল নয়— (a) তামা (b) কার্বন (c) সোনা (d) অ্যামোনিয়া

xvi) জল ও চিনির মিশ্রণের ক্ষেত্রে কোন কথাটি ঠিক— (a) জল দ্রাব, চিনি দ্রাবক (b) এদের ফিলটার করে আলাদা করা যায় (c) এদের চুম্বকের সাহায্যে আলাদা করা যায় (d) জল দ্রাবক, চিনি দ্রাব

xvii) গাছ থেকে যে জিনিসটা পাওয়া যায় না, সেটা হলো— a) কাগজ b) গঁদের আঠা c) কুইনাইন d) ছানা

xviii) নীচের কোন অস্থিসন্ধিটা অল্প অল্প নড়াচড়া করে—a) মাথার খুলির অস্থিসন্ধি b) কবজির অস্থিসন্ধি c) পঞ্জরাস্থি আর স্টারনামের অস্থিসন্ধি d) কাঁধের অস্থিসন্ধি

xix) জলের রেশম যে ধরনের উদ্ভিদ সেটা হলো— a) মস b) শ্যাওলা c) ফার্ন d) ব্যক্তবীজী

xx) ছত্রাক চাষ করে— a) চাষি পিঁপড়ে b) কালো পিঁপড়ে c) মৌমাছি d) লাল পিঁপড়ে

xxi) যে সাপ সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে সেটা হলো— a) চন্দ্রবোড়া b) কেউটে c) গোখরো d) দাঁড়াশ

2. নীচের যে কথাটি ঠিক তার পাশে '✓' আর যে কথাটি ভুল তার পাশে '×' দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 1 নম্বর)

i) সী হর্স একধরনের মাছ। [ ] ii) সাপদের কান আছে। [ ] iii) আফ্রিকার জঙ্গলে ছাড়া শিম্পাঞ্জীদের অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবেশেও পাওয়া যায়। [ ] iv) দইয়ের সাজাতে যে ছত্রাক থাকে, তারাই দুধকে দই বানিয়ে দেয়। [ ] v) বংশগত কারণ ও সঠিক পুষ্টির ওপর বৃদ্ধি নির্ভর করে। [ ] vi) আমাদের হাতের বুড়ো আঙুলে স্যাডল অস্থিসন্ধি আছে। [ ] vii) প্রশ্বাস নেওয়ার সময় বুকের খাঁচা চুপসে যায় আর বাতাস ভেতর থেকে বেরিয়ে যায়। [ ] viii) ফুসফুসীয় ধমনি বিশুদ্ধ রক্ত বয়ে নিয়ে যায়। [ ] ix) কর্ড মাছের যকৃতের তেলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন C থাকে। [ ] x) খাদ্য পিরামিডের প্রতিটি ট্রফিক লেভেলে মোট গৃহীত শক্তির মাত্র দশ শতাংশ দেহ গঠনের কাজে লাগে। [ ] xi) পুরুষ মশা রক্ত খায়। [ ]

3. শূন্যস্থান পূরণ কর : (প্রতিটি শূন্যস্থান পূরণের জন্য 1 নম্বর)

i) 5390 cc = _____ L ii) কোনো বস্তুকে মাটি থেকে ওপরে তুললে তার মধ্যে কাজ করার _____ যোগান হয়। iii) _____ হলো এমন একটি প্রাণী যা খাদ্য শৃঙ্খলের উৎপাদক ছাড়া আর সব স্তরেই থাকতে পারে। iv) এমন একটা ঘড়ি হলো _____ যাতে কোনো কাঁটা থাকে না। v) তুমি যখন জামা বা ব্যাগের চেইন আটকাও তখন যে বল প্রয়োগ করো তাকে _____ বল বলা যায়। vi) মরচে ধরা একটি _____ পরিবর্তন। vii) হিরে অধাতু হলেও তাপের _____। viii) ফিলটার করার পর প্রাপ্ত তরলকে বলা হয় _____। ix) চুনাপাথর একধরনের _____ শিলা। x) পালিশ করার জন্য প্রয়োজনীয় _____ গাছ থেকে পাওয়া যায়। xi) গো-বক আর _____ মধ্যে মিথোজীবী সম্পর্ক দেখা যায়। xii) নিজের দেহে নিজেই খাদ্য উৎপন্ন করে বলে উদ্ভিদকে বলা হয় _____। xiii) শরীরের কোথাও কেটে গেলে _____ রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। xiv) অস্থিসন্ধিতে দুটো হাড় একে অন্যের সঙ্গে _____ দিয়ে বাঁধা থাকে। xv) বল এবং সকেট সন্ধি দেখা যায় _____। xvi) প্যানথেরা টাইগ্রিস হলো _____ বৈজ্ঞানিক নাম। xvii) মেরুদন্ডী প্রাণীদের দেহের মাঝ বরাবর ভ্রূণ অবস্থায় থাকে _____ নামের একটি দন্ড। xviii) আমাদের সবার শরীর যেসব ছোটো ছোটো ঘর বা কুঠুরী দিয়ে তৈরি, তাদের বলা হয় _____। xix) পিঁপড়েদের সমাজে দাসী, সৈন্য আর শ্রমিক সবাই আসলে _____ মেয়ে। xx) মৌচাক _____ দিয়ে তৈরি। xxi) তিমি একধরনের _____ প্রাণী। xxii) চাষের জমি থেকে পাওয়া একটা বর্জ্য হলো _____। xxiii) সচল অস্থিসন্ধির ভেতর একধরনের _____ তরল থাকে। xxiv) একটা জৈব অভঙ্গুর বর্জ্য পদার্থ হলো _____।

4. স্তম্ভগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করো : (প্রতিটি সম্পর্ক স্থাপনের জন্য 1 নম্বর) (নমুনা হিসাবে একটা করে দেওয়া হলো)

I.

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ	'C' স্তম্ভ
i) বস্তুর উপরিতল	a) ঘর্ষণ	1) ক্ষয়
ii) লোহা ও চুম্বক	b) পরিমাপ	2) চাপবৃদ্ধি
iii) খাদ্য শৃঙ্খল	c) আকর্ষণ	3) বারনৌলির নীতি
iv) গাড়ির টায়ার	d) উৎপাদক	4) ক্ষেত্রফল
v) ঝড়	e) ন্যূনতম ক্ষেত্রফল	5) খাদক
vi) ছুরির ধারালো অংশ	f) বাড়ির চাল উড়ে যাওয়া	6) স্পর্শহীন বল

উ : iii) - d) - 5)

II.

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ	'C' স্তম্ভ
i) ম্যাগনেশিয়াম তারের দহন	a) তরল	1) রাসায়নিক পরিবর্তন
ii) পারদ	b) তড়িৎপ্রবাহ	2) পরিস্রাবণ
iii) কাদাগোলা জল	c) একমুখী	3) নুন
iv) জল	d) কেলাসন	4) ধাতু
v) নুন জল	e) ফিল্টার কাগজ	5) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস

III.

'A' স্তম্ভ	'B' স্তম্ভ
(i) ইডিস মশা	a) অ্যানিলিডা
(ii) পায়ের পেশি	b) মৌচাক
(iii) চিংড়ি	c) বায়ুথলি
(iv) মৌমাছি	d) কঙ্কাল পেশি
(v) ছাগল	e) ডেঙ্গি
(vi) বাম অলিন্দ	f) আর্থ্রোপোডা
(vii) ব্লোহোল	g) প্রথম শ্রেণির খাদক
(viii) জৈবভঙ্গুর বর্জ্য পদার্থ	h) বিশুদ্ধ রক্ত
(ix) ফুসফুস	i) তিমি
(x) জোঁক	j) আন্তরযন্ত্রীয় পেশি
	k) কলার খোসা

5. বেমানান শব্দ বা নামটিকে খুঁজে বার করো : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 1 নম্বর)

i) সালিম আলি, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, কনরাড লোরেঞ্জ, বারনৌলি ii) শ্যাওলা, মস, ফার্ন, তারামাছ, iii) শ্বেত রক্তকণিকা, পেশি, লোহিত রক্তকণিকা, অণুচক্রিকা, iv) তুলোগাছ, উকুন, যক্ষ্মার জীবাণু, স্বর্ণলতা, v) লিগামেন্ট, হৃৎপিণ্ড, টেনডন, অস্থি, vi) রুই মাছ, তারামাছ, টিকটিকি, শালিক vii) ব্যাং, ঘাসফড়িং, ঘাস, সাপ viii) তরিতরকারির খোসা, খড়, প্লাস্টিকের ব্যাগ, পুরোনো কাগজ।

6. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 1 নম্বর)

i) স্ক্রু-এ কোন নীতির প্রয়োগ করা হয়? ii) পতাকায় হাওয়া লাগলে তাতে ঢেউ খেলে — ঘটনাটি বিজ্ঞানের কোন নীতির উদাহরণ? iii) ঘর্ষণ বল, ঘর্ষণ তলের ক্ষেত্রফল না তার প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে? iv) খাদ্য পিরামিডের কোন স্তরে জীবের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি? v) খাদ্য শৃঙ্খলটির ফাঁকা জায়গাটি পূরণ কর। ধান → ইঁদুর → [ ] → বাজপাখি। vi) এমন একটি উদাহরণ দাও যেখানে টানা ও ঠেলা এই দুই প্রকারের যে কোনো এক প্রকারের বল প্রয়োগ করে একই কাজ করা হয়। vii) একটা খালি বাটির মধ্যে একটি কানায় কানায় জলপূর্ণ গ্লাস রাখা হলো। একটি পাথরকে সাবধানে এমনভাবে গ্লাসের জলে ফেলা হলো যাতে একটুও জল গ্লাসের বাইরে ছিটকাতে না পারে। ফলে কিছুটা জল উপছে বাটিতে পড়ল। ওই পাথরের সঙ্গে উপছানো জলের কী সম্পর্ক? viii) এমন একটি উদাহরণ দাও যেখানে 'আনুমানিক পরিমাপ' করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। ix) ঘর্ষণের ফলে ক্ষয় হয় এমন একটি উদাহরণ দাও। x) কোনো ধাতুর আকরিক বলতে কী বোঝায়? xi) একটা মিশ্র ধাতুর উদাহরণ দাও। xii) প্রাকৃতিক গ্যাসের মুখ্য উপাদানের নাম লেখো। xiii) তরলে গ্যাস মিশে দ্রবণ তৈরি হয়েছে এমন উদাহরণ দাও। xiv) দুটো আলাদা হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটা হাইড্রোজেন অণু সংকেতের সাহায্যে কীভাবে বোঝাবে? xv) অধাতু হলেও তাপের সুপরিবাহী এমন দুটো পদার্থের উদাহরণ দাও। xvi) H_2O সংকেত থেকে তুমি কী কী কথা বলতে পারো? xvii) খোলা হাওয়ায় সদ্য কেটে রাখা আপেলে বাদামি ছোপ ধরে কেন? xviii) বাঘ অল্প আলোতেও ভালো দেখতে পায় কেন? xix) অ্যাজোলার পাতায় থাকা ব্যাকটেরিয়া কীভাবে অ্যাজোলার উপকার করে? xx) পঞ্জরপেশি কোথায় থাকে? xxi) ফুসফুস প্রধানত কী দিয়ে তৈরি? xxii) দুটো ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের নাম লেখো। xxiii) আচরণ বিজ্ঞানীরা কী কী বিষয় দেখেন? xxiv) তিমিরা কীভাবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে? xxv) এক ট্রফিক লেভেল থেকে অন্য ট্রফিক লেভেলে স্থানান্তরণের সময় শক্তির অপচয়কে কোন সূত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়? xxvi) হৃৎপিণ্ড থেকে যে নলের মাধ্যমে রক্ত সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে, তার নাম কী? xxvii) ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে যে অণুজীব তাদের জীবজগতের কোন রাজ্যে রাখা হয়?

7. একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 2 নম্বর)

i) তোমার কাছে একটি দাঁড়িপাল্লা, একটি 1 কেজি ভরের বাটখারা ও এক বস্তা চাল আছে। তুমি ওই দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারার সাহায্যে কীভাবে 250 গ্রাম চালের ভর মাপতে পারবে? ii) দুটি তারার মধ্যের দূরত্বকে আলোকবর্ষ এককে প্রকাশ করা হয়। আলোকবর্ষ প্রাথমিক একক না লব্ধ একক? কেন? iii) কল থেকে কী হারে জল পড়ছে তা কোন এককে মাপবে? এই পরিমাপের জন্য কী কী যন্ত্র লাগবে? iv) তুমি যে বাড়িতে থাকো তা কি প্রকৃতই স্থির? কারণ কী? v) গতিশক্তি থেকে তাপশক্তিতে রূপান্তরের একটি উদাহরণ দাও। vi) ঘর্ষণ বল আছে বলে আমরা কী কী সুবিধা পেতে পারি? vii) তোমার দেহের একটি অঙ্গের নাম লেখো যা দুটি নততলের সমন্বয়ে তৈরি হয়। viii) তোমার বাড়িতে ব্যবহার করা হয় এমন দুটি জিনিসের নাম লেখো যাকে নততল বলা যায়। ix) তোমার হাত একটি তৃতীয় শ্রেণির লিভার। এর আলম্ব কোথায় আছে? x) জলে চিনি গোলার পরে চিনিকে চোখে দেখা যায় না। কী কী পরীক্ষা করে তুমি বলতে পারো যে চিনি হারিয়ে যায়নি দ্রবণেই আছে? xi) পেট্রোলিয়াম পরিশোধনের প্রয়োজনীয়তা কী? xii) জীবাশ্ম জ্বালানির দুটো

উদাহরণ দাও। xiii) লোহার সঙ্গে ক্রোমিয়াম মিশিয়ে যে মিশ্র ধাতু পাওয়া যায় তার সঙ্গে লোহার ধর্মের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য কী? xiv) আমাদের আশেপাশে আমরা সাধারণত কোন্ কোন্ জাতের কাককে দেখতে পাই? xv) ভিটামিন A আর D-এর অভাবে আমাদের কী সমস্যা হতে পারে? xvi) টেনডন কী কাজ করে? xvii) জঁ আঁরি ফ্যাবা আর কার্ল ফন ফ্রিশ-এঁরা যেসব প্রাণীদের নিয়ে কাজ করেছেন তাদের একটা করে নাম লেখো। xviii) শিম্পাঞ্জিরা কী খায়? xix) এমন দুটো পাখির নাম লেখো যাদের খালি শীতকালে দেখতে পাও। xx) তোমরা বাড়িতে তৈরি হওয়া একটা জৈব অভঙ্গুর আর একটা জৈব ভঙ্গুর বর্জ্য পদার্থের নাম লেখো। xxi) মাছেদের কোন পাখনা নৌকার বৈঠার মতো কাজ করে? xxii) তুমি কীভাবে তোমার চারপাশের যেকোনো একটা বর্জ্য পদার্থকে আবার কাজে লাগাতে পারো লেখো। xxiii) বাম অলিন্দ থেকে রক্ত কীভাবে ডান অলিন্দে পৌঁছায়? xxiv) প্রত্যেক জীবের একটা করে বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়ার কারণ কী?

8. তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের জন্য 3 নম্বর)

i) নীচের ঘটনাগুলিতে কোন শক্তির কোন শক্তিতে রূপান্তর ঘটছে লেখ ঃ a) ব্যাটারিচালিত ক্যালকুলেটার; b) দুটি পাথর ঘষার ফলে আগুন জ্বলে উঠল; c) ওপর থেকে একটা পাথরকে ফেলে দেওয়ায় নীচের দিকে পড়ছে। ii) তোমার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যুক্ত এমন তিনটি উদারহণ দাও যেখানে তুমি বাধ্য হও আনুমানিক পরিমাপ করতে। iii) একটি তৃণভূমির খাদ্যজালের উদাহরণ দাও। iv) যদি ঘর্ষণ বল না থাকতো তবে তোমার দৈনন্দিন জীবনে কী কী অসুবিধা হতো তার যেকোনো ছয়টি উদাহরণ দাও। v) বারনৌলির নীতির সমক্ষে একটি হাতেকলমে পরীক্ষার উল্লেখ করো। vi) চাষের জমিতে প্রয়োগ করা অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক কীভাবে উদ্ভিদ থেকে পরবর্তী শ্রেণির খাদকের দেহে প্রবেশ করতে পারে তার একটা রেখাচিত্র এঁকে দেখাও। vii) কাচের শিশি পড়ে ভেঙে গেল— এটা কী ধরনের পরিবর্তন বলবে? যুক্তিসহ লেখো। viii) ফসিল কীভাবে তৈরি হয় তার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ix) শিশির কীভাবে তৈরি হয়? x) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রঙের পরিবর্তন হচ্ছে এমন কোনো উদাহরণ তোমার জানা থাকলে বলো। xi) কোনো কঠিন জিনিসকে গুঁড়ো করে ফেললে তা তাড়াতাড়ি রাসায়নিক বিক্রিয়া করে এমন উদাহরণ দাও। এর কারণ কী? xii) কোন্ ক্ষেত্রে তুমি ফিল্টার কাগজের সাহায্যে মিশ্রণের উপাদান পৃথক করতে পারবে এবং কোন ক্ষেত্রে পারবে না তা যুক্তিসহ লেখো ঃ (a) চিনি ও জলের মিশ্রণ (b) জল ও বালির মিশ্রণ। xiii) কথাটি ঠিক না ভুল যুক্তি দিয়ে বোঝাও ঃ "কোনো ধাতুর সব খনিজই ধাতুর আকরিক।" xiv) ঘটনাগুলোর একটা করে উদাহরণ দাও ঃ a) বাতাসের অক্সিজেনের প্রভাবে ঘটা রাসায়নিক পরিবর্তন; b) সূর্যালোকের প্রভাবে ঘটা রাসায়নিক পরিবর্তন; c) তাপ প্রয়োগে ঘটা ভৌত পরিবর্তন। xv) বর্জ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে 4R পদ্ধতিটি কী? xvi) উইদের খাবার কী? উইরা এই খাবার কীভাবে হজম করে? xvii) ইস্ট কীভাবে পাঁউরুটি তৈরি করতে সাহায্য করে? xviii) বিভিন্ন মেরুদন্ডী প্রাণী বিভিন্ন রকমের দেখতে হয় কেন? xix) মাথা ঘুরিয়ে এদিক সেদিক দেখতে অস্থিসন্ধি কীভাবে আমাদের সাহায্য করে? xx) তোমার বন্ধুর ওজন 35 কেজি আর উচ্চতা 3 ফুট। তাহলে ওই বন্ধুর দেহ ভরসূচক থেকে বন্ধুর সুস্থতা সম্পর্কে তোমার কী ধারণা হলো সেটা লেখো। xxi) একটা একবীজপত্রী আর একটা দ্বিবীজপত্রী গাছের নাম লেখো। এদের বীজকে আলাদা করবে কীভাবে? xxii) শ্রমিক মৌমাছিরা কী কী কাজ করে? xxiii) বাঘিনি কীভাবে সন্তানদের পালন করে? xxiv) তিমি জলের নীচে থেকে ভেসে উঠলেই সাদা ফোয়ারা মতো দেখা যায়। এর কারণ কী? xxv) এক ট্রফিক লেভেল থেকে অন্য ট্রফিক লেভেলে শক্তির স্থানান্তরণের সময় শক্তির অপচয় হয় কেন?

9. শব্দছকটিকে সূত্রের সাহায্যে পূরণ করো : (প্রতিটি শব্দের জন্য 1 নম্বর)

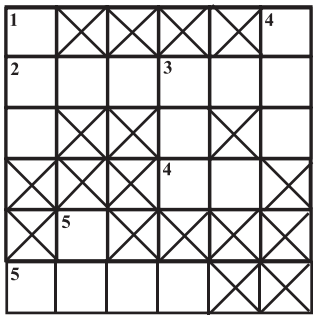

সূত্র ঃ

ওপরনীচ : (1) একরকমের আগ্নেয়শিলা

(3) জলে বাস করে এমন এক ধরনের সরীসৃপ

(4) ঘড়ির কাঁটা যা মাপে

(5) মাটির নিচ থেকে পাই আর প্রতিদিন খাই

পাশাপাশি : (2) এর সঙ্গে সন্ন্যাসী কাঁকড়ার মিথোজীবী সম্বন্ধ

(4) লেবুর _____ ছানা কাটায়

(5) উইরা এই শর্করাটা হজম করতে পারে

10. পাশে দেওয়া হৃৎপিন্ডের ছবিতে নীচে দেওয়া অংশগুলো দেখাও : (প্রতিটি অংশ দেখানোর জন্য 1 নম্বর)

বাম অলিন্দ, ডান অলিন্দ, বাম নিলয়, ডান নিলয়, মহাধমনি,ফুসফুসীয় শিরা, দ্বিপত্রক কপাটিকা, ত্রিপত্রক কপাটিকা, উর্দ্ধ মহাশিরা, নিম্ন মহাশিরা

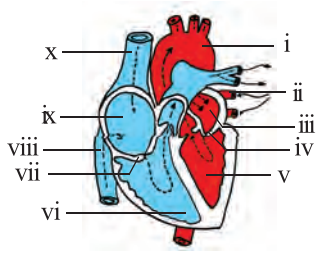

শিখন পরামর্শ

প্রথম অধ্যায়: বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্রিম্যান ডাইসন একটি কথা বলেছেন — ' It has become part of the accepted wisdom to say that the twentieth century was the century of Physics and the twenty-first century will be the century of Biology.'। এই কথাটি স্মরণে রেখে আমাদের জীবজগৎ ও প্রকৃতির বৈচিত্র্যের প্রতি নবীন শিক্ষার্থীর আগ্রহ, কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধির কথা চিন্তা করতে হবে। এই অধ্যায়টি সেই কাজের প্রথম ধাপ।

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রকৃতির বৈচিত্র্য সব বয়সের মানুষকেই আকর্ষণ করে। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত রূপ পরিস্ফুট হতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ। দ্বিতীয় অধ্যায় শিক্ষার্থীদের পরিবেশে সংঘটিত নানান ভৌত-রাসায়নিক ঘটনাসমূহের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে সাহায্য করবে। শিক্ষক এখানে ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনগুলির উদাহরণসহ প্রাথমিক বিশ্লেষণে সাহায্য করবেন। এই অধ্যায়ে প্রকৃতিতে ঘটে চলা নানাধরনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ কীভাবে বিভিন্ন ঘটনা ঘটতে প্রভাবক রূপে কাজ করে তাও দেখানো হয়েছে। যে-কোনো পরিবর্তনের জন্যই শক্তির প্রয়োজন - এই ধারণা এই অধ্যায়ে সংযোজিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: দ্বিতীয় অধ্যায়ের পর রসায়নের প্রাথমিক ধারণার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর কাছে তার চেনা জড়জগতের অচেনা ছবি পরিস্ফুট করতে হবে। নীরস তথ্যের পরিবেশন কাম্য নয় তাই পরীক্ষানিরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু শুধু পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়েই বিজ্ঞানের বহু অংশ শেখা যায় না; প্রয়োজন হয় প্রতিফলনের (reflection)। কোনো পরীক্ষা করে দেখালে তার ফলাফল বিশ্লেষণ না করলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।

চতুর্থ অধ্যায়: ব্যবহারিক প্রয়োজনে অপরিহার্য জড়জগতের এমন উপাদানগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটানো এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। শিশুকাল থেকে মিউজিয়ামে নিয়ে গিয়ে, ছবি দেখিয়ে জীবাশ্মের সঙ্গে পরিচয় ঘটানো অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষক/শিক্ষিকা জীবাশ্মের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটিয়ে ধীরে ধীরে জীব বিবর্তনের দিকে তার ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করবেন। এতে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধি পাবে। অনুসন্ধান ও সৃষ্টিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

পঞ্চম অধ্যায়: বিজ্ঞানের কোনো শাখায় পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শিক্ষার্থীকে এই বিষয়ে সচেতন করার জন্য তাদের হাতেকলমে পরিমাপ করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এতে দ্রুত অনুমান ও বিশ্লেষণের মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, যা একান্তই কাম্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়: তথাকথিত সংজ্ঞার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে শিশুর প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বল, শক্তি ও স্থিতি-গতির ধারণা প্রদান ও শিশুদের হাতেকলমে সহজলভ্য উপকরণ সহযোগে সহজসাধ্য পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে সেই ধারণার দৃঢ়ীকরণ এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

সপ্তম অধ্যায়: বর্তমান যুগে পদার্থবিজ্ঞানের সুসংহত ধারণা দেওয়া ছাড়া জীববিজ্ঞানে অগ্রগতি সম্ভব নয়। এই অধ্যায়ে চাপের ধারণা, পরিমাপ এবং জীবনের ও প্রকৃতিতে চাপের প্রভাব বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়: এই অধ্যায়ে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুসের মতো অঙ্গ এবং রক্ত, অস্থি ও পেশির মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের অবস্থান, গঠন, কলার বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, কার্য ও সমস্যার কথা উল্লেখিত হয়েছে। মানবদেহের প্রধান সংবহনতন্ত্র রক্ত; রক্তের কার্য ও সমস্যা সংগত কারণেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই অধ্যায়ের অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় এর চিত্র সম্পদ। 'অস্থি ও অস্থি সন্ধির বিচলন' অংশটি পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যার মিলনস্থল বহু সংখ্যক ছবির মাধ্যমে অঙ্গসংস্থান ও হৃৎপিণ্ডের রক্তসংবহন সযত্নে শেখানো হয়েছে।

নবম অধ্যায়: শক্তিকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাতে হলে চাই যন্ত্র, নবীন শিক্ষার্থীদের নততল, লিভার, পুলি, চক্র, অক্ষদণ্ডের কাজ বোঝাতে হাতেকলমে কাজ করতে উৎসাহ দিন এবং বিশ্লেষণে সাহায্য করুন।

দশম অধ্যায়: কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে সাধারণত খনিজ সম্পদ ও জল সম্পদ উল্লিখিত হয়ে থাকে। বর্তমানে কোনো দেশের জীববৈচিত্র্যও তার অন্যতম সম্পদরূপে পরিগণিত হয়। শুধু জীববিজ্ঞানের জ্ঞানবৃদ্ধি নয়, জীববৈচিত্র্যে সংরক্ষণের ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকটিও উপেক্ষণীয় নয়। নবীন শিক্ষার্থীর মনে ভারতের মতো ক্রান্তীয় দেশের জীববৈচিত্র্যের ধারণা দিতে এই অধ্যায়টি সংযোজিত হয়েছে। কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্রেণিবিভাগ করার প্রয়োজনীয়তা উদাহরণসহ বোঝানো হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়: প্রাণীর আচার-আচরণও মানবিক গুণের বিকাশে সহায়তা করতে পারে। এই অধ্যায়ে কয়েকটি সমাজবদ্ধ প্রাণীর কথা বলা হয়েছে। এরকম প্রাণীদের পরিবার, সমানুভূতি, পারস্পরিক সহযোগিতা, সমস্যার সমাধান ও অপত্যস্নেহের উদাহরণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে উক্ত গুণগুলির বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হন। শুধু বিজ্ঞানচর্চা নয়, মানবিক গুণের বিকাশই বর্তমানের সমস্যাদীর্ণ পৃথিবীকে অস্তিত্বের সংকট থেকে রক্ষা করতে পারে। শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে এই অধ্যায়ে বিখ্যাত আচরণ বিজ্ঞানীদের (Behavioural Biologist) কথা সংযোজিত হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়: বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো পরিবেশ দূষণ। পরিবেশ দূষণে আজ হারিয়ে যাচ্ছে বনাঞ্চল, বর্জ্যে ভরে উঠছে পৃথিবী। বর্জ্য পদার্থের প্রকৃতি, উৎস ও শ্রেণিবিভাগ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানই ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল সুনাগরিক গড়ে তোলার প্রথম ধাপ।

এই বইতে আমরা আকাদেমি বাংলা অভিধানের বানান রীতি অনুসরণ করেছি।

ভৌত পরিবেশের আলোচনার যেসব অধ্যায়ে পদার্থবিদ্যা আলোচিত হয়েছে সেখানে প্রধানত কর্মভিত্তিক শিখন প্রণালী (activity-based learning) অনুসৃত হয়েছে। শিক্ষক/শিক্ষিকা মহাশয়/মহাশয়ার মনে হতে পারে শুরুতে একটা ভূমিকা করে নেওয়া প্রয়োজন। ছাত্র/ছাত্রীদের বিষয়টিতে যেটুকু দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা আছে বলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/শিক্ষিকা মনে করবেন তার ভিত্তিতে তিনি একটি ভূমিকা করে নিয়ে কর্ম প্রক্রিয়াটি (activity) শুরু করবেন। এইভাবে শুরু করলে বিষয়টি বেশি মনোগ্রাহী হবে বলে আমাদের ধারণা।